ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারি ক্রয়ে সুশাসন:
বাংলাদেশে ই-জিপি'র কার্যকরতা পর্যবেক্ষণ

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

সরকারি ক্রয়ে সুশাসন: বাংলাদেশে ই-জিপি'র কার্যকরতা পর্যবেক্ষণ

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষক দল
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
নাহিদ শারমীন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মো. শহিদুল ইসলাম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

২০২১ সালের মধ্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা ডিজিটাল করার সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১১ সালের ২ জুন থেকে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে সিপিটিইউ'র তত্ত্বাবধানে ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (সংক্ষেপে ই-জিপি) শুরু করা হয়। প্রাথমিকভাবে চারটি প্রতিষ্ঠান - স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), সড়ক ও জনপথ (সওজ), পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে (আরইবি) ই-জিপি বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকভাবে সরকারি প্রায় সব প্রতিষ্ঠান ই-জিপি'র আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন, বিশেষকরে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও ঠিকাদারদের ই-জিপি'র ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি খাতে সরকারি ক্রয় দুর্নীতির অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশে ই-জিপি প্রবর্তনের প্রায় এক দশক অতিবাহিত হলেও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কোন মাত্রায় ই-জিপি'র চর্চা করছে, এসকল প্রতিষ্ঠান সব ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি ব্যবহার করে কিনা, ই-জিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা আছে কিনা এবং থাকলে সেগুলো কী, সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপি প্রবর্তন করার ফলে সুশাসনের ক্ষেত্রে কোনো গুণগত পার্থক্য বা উন্নতি হয়েছে কিনা, এর ফলে দুর্নীতি বা অনিয়মের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে, এবং সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত পণ্য, সম্পাদিত কাজ বা গৃহীত সেবার মানের ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি'র মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তার ওপর বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এ গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে। এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সরকারি ক্রয় খাতে সুশাসনের আঙ্গিকে ই-জিপি'র প্রয়োগ ও কার্যকরতা পর্যালোচনা করা। ই-জিপি বাস্তবায়নকারী প্রথম দিকের প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপরে উল্লিখিত চারটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর ২০টি নির্দেশকের অধীনে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, এবং তার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায় সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি'র প্রবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও এখনো সব প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয়ে এর ব্যবহার হচ্ছে না। দুর্নীতি হ্রাস ও কাজের মানের ওপর ই-জিপি'র কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় না। ক্রয় প্রক্রিয়া সহজতর হলেও একদিকে কার্যাদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ, সিন্ডিকেট এখনও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে, এবং অন্যদিকে এর পাশাপাশি কার্যাদেশ বিক্রি, অবৈধ সাব-কন্ট্রাক্ট, কাজ ভাগাভাগির কারণে কাজের মানের ওপর কোনো ইতিবাচক প্রভাব নেই। ই-জিপি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো কোনো কোনো কাজে ম্যানুয়াল পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল, ফলে ই-জিপি'র মূল উদ্দেশ্য - দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন, অনেকখানি ব্যাহত হচ্ছে। বলা যায় ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে ম্যানুয়াল থেকে কারিগরি পর্যায়ে সরকারি ক্রয়ের উত্তরণ ঘটলেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের একাংশ দুর্নীতির নতুন পথ খুঁজে নিয়েছে। তবে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ ঘটলে ই-জিপি'র সুফল পুরোপুরি পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক শাহজাদা এম আকরাম, নাহিদ শারমীন ও মো. শহিদুল ইসলাম। খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সব মুখ্য তথ্যদাতা যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়ে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে ই-জিপি ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত চ্যালেঞ্জসমূহ দূর করার মাধ্যমে আরও স্বচ্ছতা ও কার্যকরতার সাথে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব। সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক আমাদের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য বিবেচিত হলে আমাদের এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

এই গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের যেকোনো সুচিন্তিত পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

অধ্যায় এক: ভূমিকা............ ৫
১.১ প্রেক্ষাপট............ ৫
১.২ ক্রয়ের গুরুত্ব............ ৫
১.৩ সরকারি ক্রয় ও দুর্নীতি............ ৭
১.৪ বাংলাদেশে সরকারি ক্রয়............ ৯
১.৫ গবেষণার প্রশ্ন............ ১০
১.৬ গবেষণার যৌক্তিকতা............ ১০
১.৭ গবেষণার উদ্দেশ্য............ ১১
১.৮ গবেষণা পদ্ধতি............ ১২
১.৯ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি............ ১২
১.১০ তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো............ ১৩
১.১১ স্কোরিং পদ্ধতি............ ১৫
১.১২ তথ্য সংগ্রহের সময়............ ১৫
১.১৩ প্রতিবেদনের কাঠামো............ ১৫
অধ্যায় দুই: বাংলাদেশের ই-জিপি কাঠামো............ ১৬
২.১ ই-জিপি'র ধারণা............ ১৬
২.২ ই-জিপি'র প্রবর্তন............ ১৬
২.৩ ই-জিপি'র ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কাঠামো............ ১৭
২.৪ ই-জিপি সংক্রান্ত আইন ও বিধি, নির্দেশিকা............ ১৮
অধ্যায় তিন: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি............ ২২
অধ্যায় চার: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি দক্ষতা ও চর্চা............ ২৮
৪.১. গবেষণার ফলাফল............ ২৮
৪.২. ক্ষেত্র ১: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা............ ৩০
৪.৩. ক্ষেত্র ২: ই-জিপি প্রক্রিয়া............ ৩৪
৪.৪. ক্ষেত্র ৩: ই-জিপি ব্যবস্থাপনা............ ৩৮
৪.৫. ক্ষেত্র ৪: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা............ ৩৯
৪.৬. ক্ষেত্র ৫: কার্যকরতা............ ৪০
অধ্যায় পাঁচ: উপসংহার ও সুপারিশ............ ৪৭
৫.১. ই-জিপি'র ইতিবাচক প্রভাব............ ৪৭
৫.২. ই-জিপি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা............ ৪৭
৫.৩. সার্বিক পর্যবেক্ষণ............ ৪৯
৫.৪. সুপারিশ............ ৪৯

১.১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের 'সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬' অনুযায়ী ক্রয় বলতে বোঝায় কোনো চুক্তির অধীন পণ্য সংগ্রহ বা ভাড়া করা বা সংগ্রহ ও ভাড়ার মাধ্যমে পণ্য আহরণ এবং কার্য বা সেবা সম্পাদন করা।[১] একই আইন অনুযায়ী সরকারি ক্রয় বলতে বোঝায় উক্ত আইনের অধীন সরকারি তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক ক্রয়।[২]

সরকারি কার্যক্রম সম্পাদনে ক্রয় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচিত। সরকারি খাতে সারাবিশ্বে সেবা ও পণ্য ক্রয়ের পেছনে কোনো দেশের জাতীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদের (জিডিপি) গড়ে ১৩ থেকে ২০ শতাংশ ব্যয় হয়, যার পরিমাণ বছরে গড়ে প্রায় ৯.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৩] সরকারি ক্রয়ের মূল বিবেচ্য বা নীতি হচ্ছে একটি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সঠিক পণ্য সঠিক মূল্যে কেনা। সরকারি ক্রয়ে প্রধান অংশীজনদের তিনভাগে ভাগ করা যায় - প্রাথমিক অংশীজন যাদের মধ্যে রয়েছে সরকারি দপ্তর যারা ক্রয় করে, দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশীজন যাদের মধ্যে রয়েছে পণ্য সরবরাহকারী ও দরদাতা, এবং তৃতীয় পর্যায়ের অংশীজন যাদের মধ্যে রয়েছে সুবিধাভোগী হিসেবে সাধারণ জনগণ।[৪]

সরকারি ক্রয়ের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সরকারি ক্রয়ের আইন, বিধি ও প্রক্রিয়া হতে হবে সহজ, পরিষ্কার এবং ক্রয়ের প্রক্রিয়ায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করবে। সরকারি ক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পাদন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি করার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে, এবং উপযুক্ত ইলেকট্রনিক কাঠামো থাকতে হবে। পুরো প্রক্রিয়া পরিকল্পনা ও সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত দক্ষ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানবসম্পদ থাকতে হবে, এবং সর্বোপরি চুক্তি ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে।[৫]

জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য স্বচ্ছতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নৈর্ব্যক্তিক শর্তবিশিষ্ট সরকারি ক্রয়কাঠামো প্রবর্তন করবে।[৬] এ ধরনের কাঠামোতে ক্রয়ের পদ্ধতি, দরদাতাদের পূর্বশর্ত এবং পণ্যের ক্রয়ের কার্যাদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে হবে, যেন দরদাতারা দরপত্র দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় সময় পায়। দাখিলকৃত দরপত্রের যাচাই-বাছাইয়ের পূর্বশর্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। এছাড়া গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপনের কাঠামো থাকতে হবে, এবং প্রয়োনে আপিলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সবশেষে সরকারি ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন বিষয়, যেমন স্বার্থের দ্বন্দ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ, যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া ও প্রশিক্ষণ চাহিদার ওপর নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি থাকতে হবে। এই কনভেনশনের একটি সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশও এই ধারা অনুসরণ করবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সরকারি ক্রয়ের আইন ও বিধিবিধানে বিদ্যমান ক্রয়ের পদ্ধতি ও কোন সময়ে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তার পরিষ্কার ও নিরপেক্ষ বিধি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এছাড়াও ক্রয় আইনে দরপত্র দাখিলের স্বচ্ছ বিধি যার মধ্যে সময়সীমা, দরপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র, দরদাতার যোগ্যতা ও দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্যতা ও নির্বাচিত হওয়ার শর্ত উল্লেখ থাকবে। অভিযোগ দাখিল ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, আইন মেনে না চলার জন্য শাস্তি এবং কার্যাদেশপ্রাপ্তদের কার্যকর তদারকি কাঠামোর উল্লেখ থাকতে হবে ক্রয় আইনে। এই তদারকি কাঠামোর মধ্যে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ এবং তদারককারী হিসেবে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এছাড়া ক্রয় কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচার ও দুর্নীতির হুঁশিয়ারি দানকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ও ক্রয় আইনে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। উদাহরণ হিসেবে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন বিষয়ক কমিশনের (ইউএনসিআইটিআরএএল) *মডেল ল অন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট* (২০১১) এর উল্লেখ করা যায়, যেখানে ক্রয়ের নীতি, প্রয়োগের ক্ষেত্র, তথ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয়ের পদ্ধতি এবং আবশ্যকীয় বিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৭]

১.২ ক্রয়ের গুরুত্ব

সরকারি ক্রয় আমাদের দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি বড় অংশই সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে সাধিত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের (২০১৮-১৯ অর্থবছর) আকার ছিল প্রায় ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে সরকারি ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল প্রায় ২৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সরকারি ক্রয়ের পরিমাণ দেশের জিডিপি'র

---

[১] *পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন* ২০০৬, ধারা ২ (৭)।

[২] *পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন* ২০০৬, ধারা ২ (৩২)।

[৩] Transparency International. 2014. *Curbing Corruption in Public Procurement: A Practical Guide*, in Anti-Corruption Helpdesk, *Public Procurement Law and Corruption*, 2015.

[৪] Transparency International. 2006. *Handbook: Curbing Corruption in Public Procurement*, Berlin.

[৫] OECD. 2009. *OECD Principles for Integrity in Public Procurement.* http://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf (২২ এপ্রিল ২০২০)।

[৬] *জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন ২০০৪*, অনুচ্ছেদ ৯। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf (২২ এপ্রিল ২০২০)।

[৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন UNCITRAL Model Law on Public Procurement, https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement-2011/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-e.pdf (১৬ এপ্রিল ২০২০)।

প্রায় ৮% এবং জাতীয় বাজেটের প্রায় ৪৫.২%।[৮] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) প্রায় ৮০-৮৫ ভাগই ব্যয় করা হয় ক্রয়ের জন্য। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সরকারি ক্রয়ের বার্ষিক পরিমাণ ছিল প্রায় ১,৬০০ কোটি মার্কিন ডলার।[৯] এই হিসাবে ক্রয়ের জন্য প্রতি বছরই ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ছে (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারি বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন বরাদ্দের গড় থেকে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন বরাদ্দ রয়েছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বছরে গড়ে ৩০,১৯৮.২৯ কোটি টাকা (২১%), শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে গড়ে ২৫,৫০৪.৪৩ কোটি টাকা (১৮%), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে গড়ে ২১,১৮২ কোটি টাকা (১৫%), জ্বালানি ও শক্তি খাতে গড়ে ১৭,৭২০ কোটি টাকা (১৩%) (সারণি ১ ও চিত্র ২ দ্রষ্টব্য)। স্বাভাবিকভাবেই এসব খাতভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি ক্রয়ের পরিমাণও বেশি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্ভাব্য উন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ এক লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা হতে পারে বলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা দেওয়া হয়।[১০]

চিত্র ১: সরকারি ক্রয়ের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)

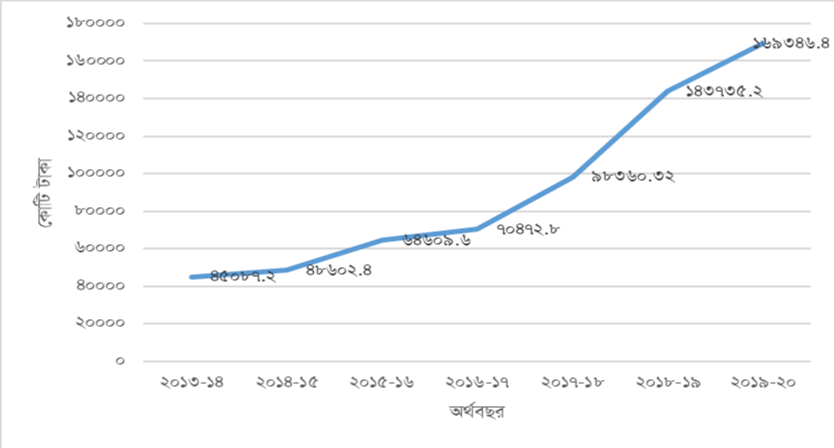

সারণি ১: বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন বরাদ্দ (২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত)[১১]

খাত	অর্থবছর					গড় ব্যয় (কোটি টাকা)
	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	
পরিবহন ও যোগাযোগ	৯,৯৪৩	১৪,৩১৫	১৮,৪৩৭	১৭,২৯১	৩৮,৭৪২	১৯,৭৪৫.৬
স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন	১২,০২৬	১৫,১৬০	১৫,৪৪৬	১৪,১২১	২৫,৪৮৩	১৬,৪৪৭.২
জ্বালানি ও শক্তি	১০,৪৭০	৫,৮৪৫	১৬,৩১৩	১৪,৫৪৬	২৪,১০৩	১৪,২৫৫.৪
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	৮,৫৯৮	১০,০৩৮	১০,৪৭৩	১৫,৬১৬	২৫,০০০	১৩,৯৪৫
কৃষি	৪,০৭২	৪,৩৭২	৫,৬২১	৬,৬৮৩	৮,৪৪৫	৫,৮৩৮.৬
স্বাস্থ্য	৩,৪১৬	৩,৬৬৭	৩,৫৯৯	৩,৫১৫	৮,৭০০	৪,৫৭৯.৪
জন প্রশাসন	৮৪৬	৯২৮	১,৬৮৪	৪,৩১২	১০,১৪৩	৩,৫৮২.৬
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	২,৩৯৮	১,৭৭৪	৩,১০৫	৩,৯২৩	৪,০৭৬	৩,০৫৫.২
গৃহায়ণ	৭৬৬	৮২৫	২,৫৭১	৩,৮৩৯	২,৫১১	২,১০২.৪
জন নিরাপত্তা	১,০৬৩	১,২২৫	১,২৯৭	১,৭৫১	২,৪৯২	১,৫৬৫.৬
শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	১,৮৮৭	১,৮৫৪	১,১৫৭	১,০০০	১,৭৫২	১,৫৩০
সংস্কৃতি ও ধর্ম	৭০৫	৬৪৩	৭৭৭	৮৯৮	১,৩১১	৮৬৬.৮
প্রতিরক্ষা	২৩৪	১০৭	২৮২	৫৯৬	৯৩০	৪২৯.৮

চিত্র ২: বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন বরাদ্দের গড় (২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত)[১২]

[৮] বিশ্বব্যাংক, ২০২০, 'অ্যাসেসমেন্ট অব বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম', © বিশ্ব ব্যাংক।
[৯] সিপিটিইউ, *পাবলিক প্রকিউরমেন্ট*, ত্রৈমাসিক নিউজলেটার, ফেব্রুয়ারি - এপ্রিল ২০১৯; https://bangla.cptu.gov.bd/upload/publication/2019-11-27-15-44-17-Newsletter-DIMAPPP-Feb---April--2019.pdf (১৬ এপ্রিল ২০২০)।
[১০] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮*, পৃ. ২৬। http://www.sdg.gov.bd/public/files/upload/5c324288063ba_2_Manifesto-2018en.pdf (২০ এপ্রিল ২০২০)।
[১১] বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বাজেট থেকে তৈরি। দেখুন https://mof.portal.gov.bd/site/view/budget_mof/ (৩০ এপ্রিল ২০২০)।
[১২] *প্রাগুক্ত*।

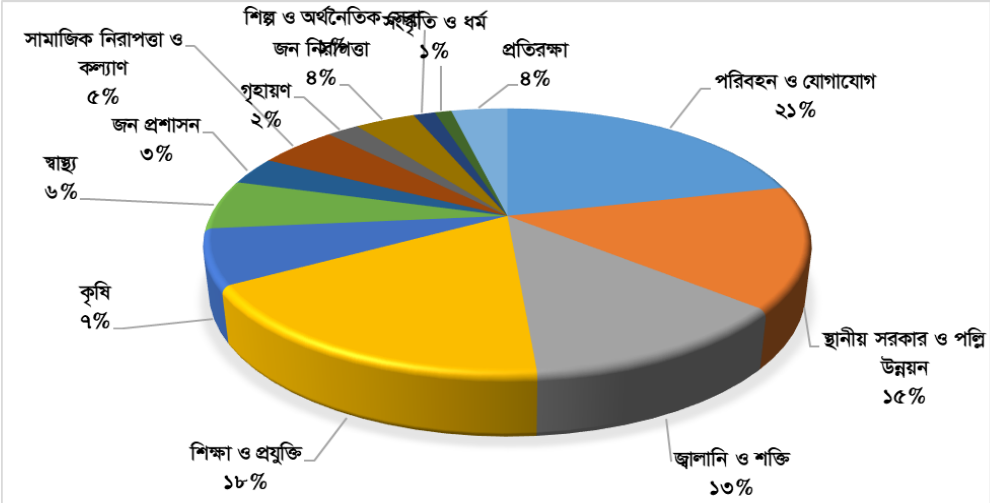

প্রায় সব সরকারি প্রতিষ্ঠানেরই ক্রয়ের কার্যক্রম রয়েছে, যাদের মধ্যে চারটি প্রতিষ্ঠান এডিপি'র প্রায় ২০ শতাংশ ব্যয় করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), সড়ক ও জনপথ (সওজ), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), এবং পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)।[১৩]

জাতীয় বিভিন্ন পরিকল্পনায় ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২-তে ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি প্রতিরোধকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং এজন্য প্রণীত আইনের উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪] প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-এ 'স্বচ্ছ সংগ্রহ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা'র কথা বলা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (অর্থবছর ২০১১-২০১৫) দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের একটি মাধ্যম হিসেবে 'ই-গভর্নেন্স' যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রবর্তনের উল্লেখ করা হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (অর্থবছর ২০১৫-২০২০) যেসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে যেমন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবহন, পানিসম্পদ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি সবগুলোর সাথেই সরকারি ক্রয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।[১৫]

রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতেও সরকারি ক্রয় প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে যেসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বড় প্রকল্পগুলো[১৬] বাস্তবায়ন করা, গ্রাম পর্যায়ে শহরের সব সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করা, সাধারণ জনগণ বিশেষকরে যুবদের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সামাজিক সুরক্ষা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন, শিল্প, কলকারখানা ও তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, এবং বিশেষকরে যোগাযোগ খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।[১৭] উল্লেখ্য, এর প্রতিটি পর্যায়েই ক্রয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

১.৩ সরকারি ক্রয় ও দুর্নীতি

সরকারি ক্রয়ের ওপর প্রচুর গবেষণা বিদ্যমান। এসব গবেষণায় যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার বিবর্তন, সরকারি ক্রয়ের বিভিন্ন মডেল, সরকারি ক্রয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ, এ প্রক্রিয়ায় শুদ্ধাচারের অবস্থা, সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতির ঝুঁকি, দুর্নীতির বিভিন্ন ধরন, সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতির কুশীলব, দুর্নীতির প্রভাব ও ক্ষতি, ই-জিপি বাস্তবায়নের সমস্যা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতির বিভিন্ন ধরনের মধ্যে রয়েছে অনুকূল কার্যাদেশ পাওয়ার জন্য ঘুষ আদান-প্রদান, সরকারি-বেসরকারি বা বেসরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসাজশ, জোর করে অর্থ আদায় বা চাঁদাবাজি, এবং জালিয়াতি।[১৮] সরকারি ক্রয়ে এসব দুর্নীতির পেছনে একাধিক কুশীলব জড়িত যারা তাদের নিজস্ব স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এসব কুশীলবের মধ্যে রয়েছেন সরকারি কর্মকর্তারা যারা সরকারি ক্রয় ও চুক্তি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত থাকেন; রাজনীতিকেরা যারা পরিকল্পনা ও চুক্তির পর্যায়ে সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করেন; দরদাতা, সরবরাহকারী, ঠিকাদার এবং

---

[১৩] *প্রাগুক্ত*।

[১৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল* ২০১২, পৃ. ২।

[১৫] পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা* ২০১৫-১৬ - ২০১৯-২০। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://plandiv.gov.bd/sites/default/files/files/plandiv.portal.gov.bd/files/9d9106e2_828d_4e33_819f_84ec5357ef4f/7th%20Five%20Year%20Plan%20Bangla%20Book.pdf (২১ এপ্রিল ২০২০)।

[১৬] এর মধ্যে রয়েছে পদ্মা সেতু, রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ, গভীর সমুদ্রবন্দর, র‍্যাপিড গণপরিবহন সেবার অবকাঠামো নির্মাণ, এলএনজি ভাসমান ইউনিট, মহেশখালি-মাতারবাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন, পায়রা সমুদ্রবন্দর, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ এবং চট্টগ্রাম-কক্সবাজার ১২৯.৫ কিলোমিটার রেল লাইন।

[১৭] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮*।

[১৮] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৪, *কারবিং কাপশন ইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট: এ প্র্যাকটিকাল গাইড*।

প্রতিযোগিতার সাথে জড়িত সাব-ঠিকাদার; দরদাতা, যৌথ উদ্যোগী অংশীদার এবং বেসরকারি সংস্থার সহযোগী প্রতিনিধিত্বকারী মধ্যস্থতাকারী; এবং ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আর্থিক মধ্যস্থতাকারী।[১৯]

বিভিন্ন গবেষণায় সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতির প্রকার নিয়ে ব্যাপক আলোচনার উদাহরণ পাওয়া যায়। দুর্নীতির একটি ধরনের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক বা উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি যা সাধারণত বাজেট প্রস্তুত পর্বে দেখা যায়; এবং আরেকটি ধরন হচ্ছে প্রশাসনিক বা আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি, যা কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে দেখা যায়।[২০] সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতির জন্য "জনপ্রিয়" কয়েকটি ক্ষেত্র হচ্ছে গণপূর্ত, মহাসড়ক, সেতু ও বাঁধ নির্মাণ, অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা, তেল ও গ্যাস, রিয়েল এস্টেট, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং আর্থিক সেবা।[২১] সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি থেকে প্রাক্কলিত ক্ষতি সাধারণত ১০% থেকে ২৫% এবং চুক্তির মূল্যের ৪০% থেকে ৫০% এর বেশি।[২২]

সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দুর্নীতি সংঘটিত হয় বলে অনেক গবেষণায় উঠে এসেছে।[২৩] ক্রয়ের পরিমাণ, সংখ্যা ও ক্রয়ের জটিলতার মাত্রার সাথে ক্রয়ের সাথে যুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের একচ্ছত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের উচ্চক্ষমতা সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি করার প্রেরণা ও সুযোগ দেয়।[২৪] এসব গবেষণা থেকে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়াকে মোটামুটি পাঁচটি ধাপে ভাগ করা যায় (বিস্তারিত দেখুন চিত্র ৩)। সরকারি ক্রয়ের প্রথম পর্যায়টি হচ্ছে পরিকল্পনা পর্যায়। এই পর্যায়ে ক্রয়ের মূল্যায়ন বা চাহিদা নির্ধারণে যেসব দুর্নীতি ঘটে তার মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব, প্রকল্প তৈরিতে উন্নয়ন অংশীদারদের প্রভাব, কারসাজি / ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুসারে ক্রয়ের পরিকল্পনা সাজানো, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ইচ্ছাকৃতভাবে বাস্তবতাবর্জিত কম বা উচ্চ বাজেট নির্ধারণ করা, প্রকল্প প্রস্তাবনায় ব্যয় নির্ধারণে অনিয়ম এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম উল্লেখযোগ্য।[২৫]

চিত্র ৩: সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি[২৬]

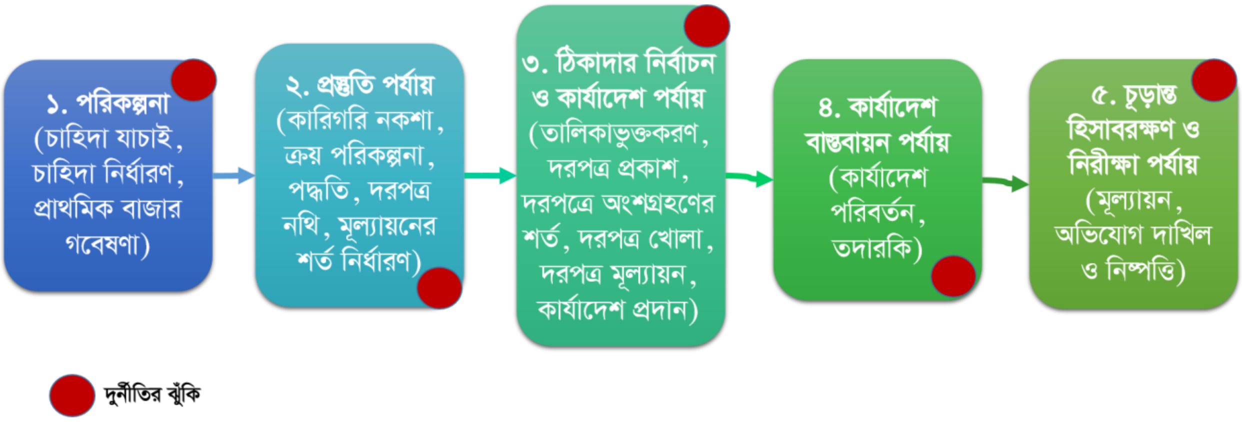

দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রস্তুতি পর্যায়ে বেশ কিছু দুর্নীতির ঘটনা ঘটে। কিছু সরকারি কর্মকর্তা কারিগরি বা যোগ্যতার পূর্বশর্ত নির্ধারণে হেরফের করেন, যেমন কিছু কারিগরি পূর্বশর্ত কৃত্রিমভাবে আরোপ করা, বিশেষকরে অন্যকে বাদ দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড বা ট্রেডমার্ক নির্ধারণ করে দেওয়া। কোনো কোনো সময় একাধিক ছোট চুক্তি একসাথে করে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব অদক্ষতা পাওয়া যায় তার মধ্যে একসাথে বিভিন্ন পর্যায়ে দীর্ঘসূত্রতা, বাজার ও পণ্য সম্পর্কে জ্ঞানের ঘাটতি, অদক্ষভাবে দরপত্রের নথি প্রস্তুত করা, আমলাতান্ত্রিক অনুমোদনের পদ্ধতি, এবং অংশীদারদের অংশগ্রহণ, মতামত গ্রহণ, অভিযোগ দাখিল, জালিয়াতি ও দুর্নীতি নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।[২৭]

---

[১৯] দেখুন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১০, *করাপশন অ্যান্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট*, কার্যপত্র; *অ্যান্টি-করাপশন হেল্পডেস্ক: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ল অ্যান্ড করাপশন*, ২০১৫; আফ্রিকান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক, আফ্রিকান ডেভলপমেন্ট ফান্ড, ২০১৪, 'কমপ্রিহেনসিভ রিভিউ অব দি এএফডিবি'স প্রকিউরমেন্ট পলিসিস অ্যান্ড প্রসিডিউরস', ওআরডিএফ; টিনা সোরেড, ২০০২, *করাপশন ইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট: কজেস, কনসিকোয়েন্সেস অ্যান্ড কিউরস*, সিএমআই; ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৫, *অ্যান্টি-করাপশন হেল্পডেস্ক: বাংলাদেশ: করাপশন রিস্কস ইন দি পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম*।

[২০] টিনা সোরেড, ২০০২, *করাপশন ইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট: কজেস, কনসিকোয়েন্সেস অ্যান্ড কিউরস*, সিএমআই।

[২১] আফ্রিকান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক, আফ্রিকান ডেভলপমেন্ট ফান্ড, ২০১৪, 'কমপ্রিহেনসিভ রিভিউ অব দি এএফডিবি'স প্রকিউরমেন্ট পলিসিস অ্যান্ড প্রসিডিউরস', ওআরডিএফ।

[২২] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৬, *হ্যান্ডবুক: কারবিং কাপশন ইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট*, বার্লিন।

[২৩] কারি কে হেগস্টাড ও মোনা ফ্রয়স্টাড, *দি বেসিকস অব ইন্টেগ্রিটি ইন প্রকিউরমেন্ট*, ইউফোর ইস্যু, অক্টোবর ২০১১, নং ১০,ইউফোর অ্যান্টি-করাপশন রিসোর্স সেন্টার ও সিএমআই; ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৫, *অ্যান্টি-করাপশন হেল্পডেস্ক: বাংলাদেশ: করাপশন রিস্কস ইন দি পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম*।

[২৪] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৫, *অ্যান্টি-করাপশন হেল্পডেস্ক: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ল অ্যান্ড করাপশন*।

[২৫] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৫, *অ্যান্টি-করাপশন হেল্পডেস্ক: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড করাপশন*।

[২৬] বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ থেকে তৈরি। দেখুন জেরেমি পোপ, *কনফ্রনটিং করাপশন: দি এলিমেন্টস অব আ ন্যাশনাল ইন্টেগ্রিটি সিস্টেম*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সোর্সবুক ২০০০; ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৫, *অ্যান্টি-করাপশন হেল্পডেস্ক: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড করাপশন*; ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৫, *অ্যান্টি-করাপশন হেল্পডেস্ক: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ল অ্যান্ড করাপশন*; ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৪, *কারবিং কাপশন ইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট: এ প্র্যাকটিকাল গাইড*; ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১০, *করাপশন অ্যান্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট*, কার্যপত্র।

[২৭] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৫, *অ্যান্টি-করাপশন হেল্পডেস্ক: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড করাপশন*।

সরকারি ক্রয়ের তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে ঠিকাদার নির্বাচন ও কার্যাদেশ প্রদান। এ পর্যায়ে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা একটি বড় সমস্যা, যা কাজের আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। বাছাই করা কয়েকটি অংশগ্রহণকারীর কাছে গোপন নথি প্রকাশ করা হয়, স্বল্প সময় নির্ধারণ করা হয়, এবং কখনো কখনো মূল তথ্য বাদ দেওয়া হয়। সর্বনিম্ন দর প্রস্তাব করার সুবিধা দেওয়ার জন্য পছন্দের ব্যক্তিকে ভেতরের তথ্য প্রদান করা হয়। এ পর্যায়ে দরপত্রের নথি জমা দেওয়ায় বাধা সৃষ্টি করা হয়, এবং এ পর্যায়ে দরপত্র বাক্স ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটে। এছাড়াও অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে কোনো কোনো দরদাতা দরপত্র কারচুপির পরিকল্পনায় অংশ নেন। এসব দরদাতারা যোজসাজশের ভিত্তিতে উচ্চমূল্য প্রস্তাব করেন যেন নির্দিষ্ট একজন দরদাতা কাজটি পান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট দরদাতাকে বাদ দেওয়ার জন্য মূল্যায়নের মানদণ্ড নিরপেক্ষ রাখা হয় না। কার্যাদেশের সর্বোচ্চ মাত্রা মেনে চলার বিষয় লক্ষ রাখা হয় না। এছাড়া ঠিকাদারদের লাইসেন্স ব্যবহারেও অনিয়ম দেখা যায়।[২৮]

সরকারি ক্রয়ের কার্যাদেশ বাস্তবায়ন পর্যায়ে কিছু দুর্নীতির ঘটনা ঘটে। কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদার অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ঐ কাজের সাব-কন্ট্রাক্ট দিয়ে দেন, বা অনেকক্ষেত্রে কার্যাদেশটি বিক্রি করে দেন। কখনো কখনো কাজের আদেশ পাওয়ার পরে তথ্য পরিবর্তন করা হয় - অতিরিক্ত ব্যয়সহ চুক্তিতে অযথা সংশোধন করা হয়। কখনো কখনো পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় না। এছাড়া সরবরাহকৃত পণ্য ও সম্পন্ন কাজ চুক্তিতে উল্লিখিত মানের তুলনায় নিম্নমানের হতে পারে বা একেবারেই সরবরাহ করা হয় না।[২৯]

চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্রয়ের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা করা হয়। এ পর্যায়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের দ্বারা চাঁদাবাজি বা ঠিকাদারদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের ঘটনা ঘটে। ঠিকাদারদের চূড়ান্ত বিল থেকে কমিশন আদায় করা হয়। সুরক্ষা আমানতের অর্থ উত্তোলনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে ঠিকাদারদের হয়রানির ঘটনা ঘটে।[৩০]

১.৪ বাংলাদেশে সরকারি ক্রয়

বাংলাদেশে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সাধারণ আর্থিক বিধিমালার একটি সংকলন (সিজিএফআর) সরকারি ক্রয় পদ্ধতি ও চর্চা নিয়ন্ত্রণ করত। ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) সাথে যৌথভাবে দেশের সরকারি ক্রয়ব্যবস্থার মূল্যায়নের জন্য একটি গবেষণা হাতে নেয়। সরকারি ব্যয়ে 'ভ্যালু ফর মানি' অর্জনে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি ক্রয়ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ২০০২ সালে গবেষণাটি থেকে তিনটি প্রধান সুপারিশ করা হয় - প্রথমত, একটি পলিসি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা; দ্বিতীয়ত, সংস্কার সম্পাদন করা; তৃতীয়ত, সরকারি ক্রয়ের সক্ষমতা বাড়ানো। বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগের (আইএমইডি) অধীন 'সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট' (সিপিটিইউ) গঠন করে, ২০০৩ সালে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন জারি করে এবং ২০০২ সালে গৃহীত একটি প্রকল্পের আওতায় সংস্কার বাস্তবায়ন শুরু করে। স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টস (এসটিডি) এবং অন্যান্য নীতিমালা প্রস্তুত ও জারি করা হয়। সক্ষমতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা হয়। ২০০৩ সালের অক্টোবরে সরকার নতুন সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত প্রবিধান জারি করে। তবে উপরোক্ত বিধিগুলিতে দুটি লক্ষণীয় সীমাবদ্ধতা ছিল - সামরিক ক্রয়সহ রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে ছাড়, এবং এসব বিধি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক বিষয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্তগ্রহণের অনুমোদন। উপরোক্ত সীমাবদ্ধতাগুলো থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন' প্রণীত হয়, এবং এরপরে ২০০৮ সালে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি' (পিপিআর) জারি করা হয়, এবং ২০০৮ সালের জানুয়ারিতে আইন ও বিধিমালা উভয়ই কার্যকর করা হয়। তখন থেকেই সরকারি ক্রয় একীভূত আইন ও বিধি অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে।

ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (সংক্ষেপে ই-জিপি) বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথভাবে বাস্তবায়িত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট টু এর অন্যতম একটি উপাদান। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ছিল ২০০৮ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে সিপিটিইউ'র ই-জিপি পোর্টালটি ২০১১ সালের ২ জুন চালু করা হয়, যা তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক অনলাইন সরকারি ক্রয়ব্যবস্থা। এটি ২০২১ সালের মধ্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা ডিজিটাল করার সরকারের প্রতিশ্রুতি।[৩১] এর অংশ হিসেবে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ (ধারা ৬৫) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ (বিধি-১২৮) অনুসারে 'বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) গাইডলাইন ২০১১' প্রণীত হয়। বর্তমানে ই-জিপি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রকল্প (ডিআইএমএপিপিপি) ডিজিটালাইজিং চলছে যার বাস্তবায়নের সময় ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত।

প্রাথমিকভাবে তিনটি সংস্থা - স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ) ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ই-জিপি বাস্তবায়ন করেছে, এবং পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) পরে যোগ দেয়। সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি পরিচালনা করে সিপিটিইউ। গত কয়েক বছরে এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

[২৮] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৫, *অ্যান্টি-করাপশন হেল্পডেস্ক: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ল অ্যান্ড করাপশন*; মর্গনার ও চেন, ২০১৪, *টপিক গাইড অন পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট*, অ্যান্টি-করাপশন হেল্পডেস্ক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল।

[২৯] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৫, *অ্যান্টি-করাপশন হেল্পডেস্ক: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ল অ্যান্ড করাপশন*।

[৩০] *প্রাগুক্ত*।

[৩১] সিপিটিইউ, *পাবলিক প্রকিউরমেন্ট*, ত্রৈমাসিক নিউজলেটার, মে-জুলাই ২০১৯; https://bangla.cptu.gov.bd/upload/publication/2019-11-27-15-47-14-Newsletter-DIMAPPP-May---July--2019.pdf (১৬ এপ্রিল ২০২০)।

১.৫ গবেষণার প্রশ্ন

সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতির উপস্থিতি নিয়ে ওপরের আলোচনা থেকে নিচের প্রশ্নগুলো উত্থাপন করা যায়, যার উত্তর এখন পর্যন্ত কোনো গবেষণায় উঠে আসে নি।

১. বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কোন মাত্রায় ই-জিপি'র চর্চা করছে? কোন কোন প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে ভাল চর্চা করছে?
২. সরকারি ক্রয়ের ধরন ও প্রকৃতি বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? নাকি এটি প্রাতিষ্ঠানিক ও সর্বজনীন?
৩. সব সরকারি প্রতিষ্ঠান কি সব ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি ব্যবহার করে? কত শতাংশ ক্ষেত্রে ই-জিপি ব্যবহার করে? ই-জিপি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী?
৪. সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপি প্রবর্তন করার ফলে সুশাসনের ক্ষেত্রে কোনো গুণগত পার্থক্য বা উন্নতি হয়েছে কি? এর ফলে দুর্নীতি বা অনিয়ম কমেছে, নাকি কোনো পরিবর্তন হয় নি?
৫. সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত পণ্য, সম্পাদিত কাজ বা গৃহীত সেবার মানের কোনো উন্নতি হয়েছে কি?

১.৬ গবেষণার যৌক্তিকতা

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী সরকারি খাতে সরকারি ক্রয় দুর্নীতির প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। সরকারি ক্রয়ে ঘুষ ও দুর্নীতির কারণে বিশ্বব্যাপী বছরে কমপক্ষে ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়; এর ফলে প্রাক্কলিত অর্থনৈতিক ক্ষতি বার্ষিক জিডিপির ১.৫% এরও বেশি।[৩২] একটি সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ৪৯.৬ শতাংশের মতে বাংলাদেশেও সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতিকে একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তাদের ৪৭.৭ শতাংশকে একবার হলেও ঘুষ দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে, এবং সরকারি কার্যাদেশ নিশ্চিত করার জন্য ৪৮.৯ শতাংশের কাছ থেকে উপহার প্রত্যাশা করা হয়েছে, যার বিনিময় মূল্য চুক্তির মোট মূল্যের ২.৯ শতাংশ।[৩৩] ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল কমপিটিটিভনেস প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৪ অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কার্যাদেশ বা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অবৈধভাবে অর্থ বা ঘুষ দেওয়া খুব সাধারণ ঘটনা [এটি ১ (খুব সাধারণ) থেকে ৭ (কখনোই নয়) এর মধ্যে ১.৯ রেটিংপ্রাপ্ত]। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে সুসম্পর্ক বজায় রাখে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি সরকারি কর্মকর্তাদের পক্ষপাতিত্ব বেশি, যার রেটিং ২.২ [যা ১ (সর্বদা পক্ষপাতিত্ব দেখান) থেকে ৭ (কখনই পক্ষপাতিত্ব দেখান না) এর মধ্যে]।[৩৪]

বিভিন্ন সরকারি খাত (যেমন বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, স্বাস্থ্য, জলবায়ু অর্থায়ন) ও প্রতিষ্ঠানের (যেমন বাংলাদেশ বিমান, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড) ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) সম্পন্ন গবেষণায় ক্রয়-সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্নীতির বিভিন্ন ঘটনা উদঘাটিত হয়েছে। এসব গবেষণায়ও ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির ফলে বাজেটের একটি বড় অংশের ক্ষতি (৮.৫% থেকে ২৭%) পরিলক্ষিত হয়েছে, যা এই প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির প্রতিষ্ঠানিকীকরণের দিকে নির্দেশ করে।[৩৫] তবে এসব গবেষণার মূল আলোচনার বিষয় ক্রয় ছিল না বলে সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নিয়ে বিস্তারিত ও গভীর আলোচনার ঘাটতি ছিল।

অন্যদিকে ই-জিপি প্রবর্তনের পরে সরকারি ক্রয়ে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে সে বিষয়েও কয়েকটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশে ই-জিপি'র ব্যবহার নিয়ে সম্পন্ন বেশিরভাগ গবেষণায় ই-জিপি ব্যবহারের ইতিবাচক প্রভাব, ক্রয় প্রক্রিয়ার প্রবণতা ও জনগণের তদারকির প্রভাব আলোচিত। বিশ্ব ব্যাংকের (২০২০) সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় বাংলাদেশে সরকারি ক্রয়ের সার্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় আইনি, নীতিগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও সক্ষমতা, ক্রয়ের কার্য পরিচালনা ও বাজার ব্যবস্থা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং সার্বিকভাবে সরকারি ক্রয়ের অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে।[৩৬]

ওয়াহিদ আবদাল্লা (২০১৫) তাঁর গবেষণায় ই-জিপি'র ফলে মূল্যের বিপরীতে ব্যয় হ্রাস এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর প্রভাব পর্যালোচনা করেছেন। দেখা যায় প্রথমত একই ধরনের ক্রয়ের ক্ষেত্রে গতানুগতিক ক্রয় প্রক্রিয়ার তুলনায় ই-জিপি ব্যবহারের ফলে ব্যয় সাশ্রয়

---

[৩২] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৪, *কারবিং কাপশন ইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট: এ প্র্যাকটিকাল গাইড*।
[৩৩] বিশ্বব্যাংক, ২০১৩, *এন্টারপ্রাইজ সার্ভেস*; https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2013/bangladesh#corruption (১৬ এপ্রিল ২০২০)।
[৩৪] ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, *গ্লোবাল কমপিটিটিভনেস রিপোর্ট ২০১৩-২০১৪*; https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014 (১৬ এপ্রিল ২০২০)।
[৩৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স: একটি ডায়াগনস্টিক গবেষণা' (২০০৭); 'দি স্টেট অব দি গভার্নেন্স ইন পাওয়ার সেক্টর অব বাংলাদেশ: প্রবলেমস অ্যান্ড দ্যা ওয়ে আউট' (২০০৭); 'সরকারি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' (২০১০); 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' (২০১৩); 'বিটিসিএল: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' (২০১৪); 'স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' (২০১৪); 'মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় (২০১০); 'জলবায়ু অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড' (২০১৭); 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি): পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' (২০১৭); 'ঢাকা ওয়াসা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' (২০১৯)। এসব গবেষণার প্রতিবেদন ও সার-সংক্ষেপের জন্য দেখুন https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/
[৩৬] বিশ্বব্যাংক, ২০২০, 'অ্যাসেসমেন্ট অব বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম', © বিশ্ব ব্যাংক।

হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ই-জিপি ব্যবহারের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল স্থানীয় পর্যায়ে ও বেশি দরদাতার অংশগ্রহণের ফলে ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে।[৩৭]

হোসেন ও অন্যান্য (২০১৬) আরেকটি গবেষণায় এলজিইডি'র দ্বারা বাস্তবায়িত কাজের ওপর স্থানীয় নাগরিকদের তদারকি কতটুকু ও কীভাবে কাজ করে তা দেখিয়েছেন। উল্লেখ্য, এটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রকল্প ২-এর আওতায় সিপিটিইউ-এর একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত।[৩৮]

হাসান ও অন্যান্যের (২০১৬) গবেষণায় ই-জিপি প্রয়োগের কিছু বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। দেখা যায় সব ঠিকাদার বর্তমানে প্রযুক্তিগতভাবে ই-জিপি ব্যবস্থার সাথে পরিচিতি না, বেশিরভাগের কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারেন না এবং এর ফলে গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হন। দরপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে তাঁদের অন্যের সহায়তা নিতে হয়। পেশাদার কম্পিউটার অপারেটরদের (স্থানীয় কম্পিউটার সেবাদাতা মালিক বা কর্মচারী) সাহায্য নেওয়ার ফলে দরপত্র প্রক্রিয়ার সুরক্ষা, স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সমস্যা তৈরি করে। কম্পিউটার অপারেটর অর্থের বিনিময়ে অন্যান্য প্রতিযোগী দরদাতাদের কাছে গোপনীয় তথ্য (ব্যবহারকারীর আইডি, পাসওয়ার্ড, হার/ পরিমাণ ইত্যাদি) সরবরাহ করে। অনেক ঠিকাদার প্রকৌশলীদেরও অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করে, যারা সাধারণত অফিসের সময়ের পরে অফিসের কম্পিউটার সুবিধা ব্যবহার করেন। এর ফলে অনলাইন ক্রয় প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা গুরুতরভাবে খর্ব হয়। বিনিময়ে এসব প্রকৌশলী ই-জিপি সিস্টেম পরিচালনা করার জন্য প্রযুক্তিগতভাবে দুর্বল কিন্তু মরিয়া দরদাতাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ফি গ্রহণ করে। ই-জিপি প্রবর্তনের পরে উপজেলা অফিসে অবস্থিত কারিগরি কর্মকর্তাদের (প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী) কাজের চাপ বেড়েছে।[৩৯]

ম্যানুয়াল ব্যবস্থার চেয়ে ই-জিপি-র অধীনে দরদাতাদের নির্বাচন বা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বেশি কার্যকর, ই-জিপি খুব সুরক্ষিত, কারসাজি করা প্রায় অসম্ভব, এবং দরদাতাদের পাশাপাশি দরদাতা ও কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগসাজশের কোনো সম্ভাবনা নেই বলে প্রকৌশলীরা দাবি করলেও বিআইজিডি'র গবেষণায় দেখা যায় এসব দাবি বাস্তবের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন, ওপেন টেন্ডারিং পদ্ধতির (ওটিএম) মাধ্যমে পরিচালিত ই-জিপি'তে দেশের যেকোনো জায়গা থেকে যেকোনো দরদাতা দরপত্র জমা দিতে পারেন। তবে বাস্তবে দেখা যায় কোনো ঠিকাদার কাজ পেলেও যে এলাকা তার 'নিয়ন্ত্রণে' নেই (স্থানীয় রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সাথে পূর্ব পরিচয় বা নেটওয়ার্ক) সেখানে তাঁর কাজ করা খুবই কঠিন। স্থানীয় ঠিকাদার, যাদের স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক যোগাযোগ রয়েছে, এবং যারা কাজ পায়নি, তারা এ ধরনের 'বহিরাগত'কে কোনোভাবেই কাজ করতে দেবেন না। বাস্তবে এসব বহিরাগত যারা কাজ পান তাদেরকে স্থানীয় প্রভাবশালীদের খুশি করে কাজ করতে হয়। বিশেষকরে ছোটখাট প্রকল্পের কাজে যেসব ছোটখাট ঠিকাদার কাজ পান তাদের জন্য এটি অসুবিধাজনক।[৪০]

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি ২০৩০) বলা হয়েছে, "জাতীয় নীতি ও অগ্রাধিকার অনুসারে টেকসইযোগ্য সরকারি ক্রয়কে উৎসাহিত করতে হবে" (লক্ষ্য ১২.৭)।[৪১] জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য স্বচ্ছতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নৈর্ব্যক্তিক শর্তবিশিষ্ট সরকারি ক্রয়কাঠামো প্রবর্তন করবে। জাতিসংঘ ও কনভেনশনের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে উপরোক্ত শর্ত পূরণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে আইন-কানুন কতটুকু মেনে চলা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে ভাল চর্চার উদাহরণ আছে কিনা তার ওপর বিস্তারিত ধারণার ঘাটতি রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতির কাঠামো, প্রকৃতি এবং মাত্রা সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট ও গভীর গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান।

১.৭ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সরকারি ক্রয় খাতে সুশাসনের আঙ্গিকে ই-জিপি'র প্রয়োগ ও কার্যকরতা পর্যালোচনা করা। গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে -

১. বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্রয় আইন ও বিধি অনুযায়ী ই-জিপি কতটুকু অনুসরণ করা হয় তা চিহ্নিত করা;
২. ই-জিপি যথাযথভাবে অনুসরণ না হলে তার কারণ অনুসন্ধান করা;
৩. বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি'র কার্যকরতা পর্যালোচনা করা; এবং
৪. ই-জিপি'র প্রয়োগে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করা।

---

[৩৭] ওয়াহিদ আবদাল্লাহ, 'ইফেক্ট অব ইলেক্ট্রনিক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট: এভিডেন্স ফ্রম বাংলাদেশ', ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার, কার্যপত্র, মে ২০১৫।
[৩৮] ড. মো. শানাভেজ হোসেন, গাজী আরাফাত উজ জামান মার্কনি, রায়হান আহমদ, 'সিটিজেন এনগেজমেন্ট ইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট: এক্সপেরিয়েন্স ফ্রম পাইলট ডিসট্রিক্টস, কেস স্টাডি', বিআইজিডি ও বাংলাদেশ সরকার, সেপ্টেম্বর ২০১৬।
[৩৯] ড. মির্জা হাসান, মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান, মো. মাহান উল হক, 'ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট: টুওয়ার্ডস অ্যান এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাট দি লোকাল লেভেল', পলিসি নোট, আগস্ট ২০১৬, বিআইজিডি ও বাংলাদেশ সরকার।
[৪০] ড. মির্জা হাসান, মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান, মো. মাহান উল হক, 'ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট: টুওয়ার্ডস অ্যান এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাট দি লোকাল লেভেল', পলিসি নোট, আগস্ট ২০১৬, বিআইজিডি ও বাংলাদেশ সরকার।
[৪১] সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, ২০১৭, *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ)*, (২য় সং)।

১.৮ গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সংখ্যাগত তথ্যও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ই-জিপি বাস্তবায়নকারী প্রথম দিকের প্রতিষ্ঠান হিসেবে চারটি সরকারি প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে - (১) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি); (২) সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ); (৩) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো); এবং (৪) পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)।

দ্বিতীয়ত, বাছাইকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি ক্রয় আইন কতটুকু পালন করা হয় তা বিভিন্ন নির্দেশকের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাঁচটি ক্ষেত্রের অধীনে ২০টি নির্দেশককে বিন্যস্ত করা হয়েছে (সারণি ২ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ২: গবেষণায় ব্যবহৃত ক্ষেত্র ও নির্দেশক

ক্ষেত্র	নির্দেশক						
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা	ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ভৌত সক্ষমতা	ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সক্ষমতা	ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ	ই-জিপি'র ব্যবহার	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)	ক্রয় সীমা
ই-জিপি প্রক্রিয়া	ই-জিপি'তে নিবন্ধন	টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া	প্রাক টেন্ডার মিটিং	ই-বিজ্ঞাপন	টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়া	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	
ই-জিপি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি					
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	অভিযোগ নিষ্পত্তি	নিরীক্ষা	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ				
কার্যকরতা	ই-জিপি'র ফলে দুর্নীতি হ্রাস	ই-জিপি'র ফলে কাজের মান বৃদ্ধি					

তৃতীয়ত, প্রত্যেক নির্দেশকের তিনটি সম্ভাব্য স্কোর ধরা হয়েছে - উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন যা তিনটি রংয়ের মাধ্যমে (ট্রাফিক সিগন্যাল পদ্ধতি) উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক নির্দেশকের জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পূর্ব-নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ওপর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী প্রত্যেক নির্দেশকের স্কোর দেওয়া হয়েছে। সবশেষে এই স্কোর একটি ডাটাবেজে এন্ট্রি দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৯ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

গবেষণায় নিচের পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১. **গবেষণা পর্যালোচনা** - পরোক্ষ উৎস হিসেবে গবেষণা-সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ, প্রাতিষ্ঠানিক বার্ষিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. **সাক্ষাৎকার ও দলগত আলোচনা** - তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ক্রয় বিশেষজ্ঞ, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঠিকাদার, এবং সংবাদ-মাধ্যম কর্মীদের সাথে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও নিবিড় সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান থেকে বাছাইকৃত প্রকল্পের ওপর দলগত আলোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বনিম্ন যে পর্যন্ত ক্রয় করার অনুমোদন রয়েছে সেই পর্যায় পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সুবিধাজনক নমুনায়নের মাধ্যমে সারা দেশে চারটি প্রশাসনিক বিভাগের একটি করে জেলা এবং সে জেলার একটি উপজেলা পর্যায়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অবস্থিত কার্যালয় ও ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয় - এভাবে চারটি প্রতিষ্ঠানের মোট ৫২টি কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (সারণি ৩ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ৩: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহের এলাকা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান	ই-জিপি বাস্তবায়ন	জেলা (সংখ্যা)	উপজেলা (সংখ্যা)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)	কেন্দ্রীয় পর্যায় - ১ আঞ্চলিক - ১৪ জেলা - ৬৪ উপজেলা - ৪৬০	সব পর্যায়ে ই-জিপি বাস্তবায়িত হচ্ছে	৪	৪
সড়ক ও জনপথ বিভাগ (গওজ)	কেন্দ্রীয় পর্যায় - ১ আঞ্চলিক - ১০ জেলা - ৬৪	সব পর্যায়ে ই-জিপি বাস্তবায়িত হচ্ছে	৪	-

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান	প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান	ই-জিপি বাস্তবায়ন	জেলা (সংখ্যা)	উপজেলা (সংখ্যা)
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি)	কেন্দ্রীয় পর্যায় - ১ আঞ্চলিক - ৯ সার্কেল - ২২ বিভাগীয় (জেলা) - ৭৪	সব পর্যায়ে ই-জিপি বাস্তবায়িত হচ্ছে	৪	৪
পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)	জেলা - ৬১ উপজেলা - ৪৬০ সমিতি - ৮০	সব পর্যায়ে ই-জিপি বাস্তবায়িত হচ্ছে	৪	৪

১.১০তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো

পাঁচটি ক্ষেত্রের অধীনে ২০টি নির্দেশকের ভিত্তিতে বাছাইকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি ক্রয় আইন কতটুকু পালন করা হয় তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক নির্দেশকের জন্য তিনটি সম্ভাব্য স্কোর - উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন প্রদান করা হয়েছে, যা তিনটি রংয়ের মাধ্যমে (ট্রাফিক সিগন্যাল পদ্ধতি) উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্ব-নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে প্রত্যেক নির্দেশকের স্কোর দেওয়া হয়েছে ও এই স্কোর একটি ডাটাবেজে এন্ট্রি দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিচে প্রত্যেক নির্দেশকের অধীনে আলোচিত বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।[৪]

ক্ষেত্র ১: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

১. **ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা** - গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সব ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি ব্যবস্থা ব্যবহার করার মতো সক্ষমতার প্রয়োজন। এজন্য জানতে হবে ই-জিপি পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় কিনা। বরাদ্দ দেওয়া হলে, অর্থের পরিমাণ পর্যাপ্ত কিনা। এবং বরাদ্দ দেওয়া না হলে, কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় কিভাবে বহন করেন।

২. **ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ভৌত সক্ষমতা** - গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সব ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি ব্যবস্থা ব্যবহার করার মতো সক্ষমতার প্রয়োজন। এজন্য জানতে হবে ই-জিপি পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো রয়েছে কিনা, যেমন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, লজিস্টিকস ইত্যাদি।

৩. **ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সক্ষমতা** - গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সব ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি ব্যবস্থা ব্যবহার করার মতো সক্ষমতার প্রয়োজন। এজন্য জানতে হবে ই-জিপি পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি কাঠামো রয়েছে কিনা, যেমন কম্পিউটার, মডেম, নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুত (৪-জি) নেটওয়ার্ক, ফটোকপি মেশিন ইত্যাদি।

৪. **ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ** - গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সব ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি ব্যবস্থা ব্যবহার করার মতো সক্ষমতার প্রয়োজন। ফলে জিজ্ঞাস্য বিষয় হচ্ছে ই-জিপি পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়-সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে কিনা। তারা যথাযথভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে কিনা। না হলে, কেন পারে না।

৫. **ই-জিপি'র ব্যবহার** - গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সব ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে ই-জিপি ব্যবস্থায় ক্রয় করতে হয়। এক্ষেত্রে জানতে হবে ই-জিপি গাইডলাইনে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে কিনা। বিস্তারিত উল্লেখ না থাকলে কোথায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ই-জিপি গাইডলাইনে উল্লিখিত টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কিনা। সমস্যা হলে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান সব ধরনের ক্রয়েই ই-জিপি অনুসরণ করে কিনা। না করলে কেন করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে ই-জিপি অনুসরণ করা হয় না, এবং কত শতাংশ ক্রয়ে ই-জিপি অনুসরণ করা হয় না।

৬. **বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)** - গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। এক্ষেত্রে জানা প্রয়োজন গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা করা হয় কিনা। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় কিনা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা না হলে, কেন করা হয় না। ক্রয় পরিকল্পনা না হলে কেন করা হয় না। কী কী কারণে ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তন করা হয়।

৭. **ক্রয় সীমা** - সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্রয়ের অর্থমূল্য অনুযায়ী ক্রয় সীমা নির্ধারণ করা হয়। কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা কত টাকার ক্রয়ের কার্যাদেশ দিতে পারবেন সেটিরও প্রতিষ্ঠানভেদে তারতম্য রয়েছে। কাজেই জানা প্রয়োজন ক্রয় সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রয়সীমা সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত রয়েছে কিনা। ক্রয়সীমা থাকলে কোন পর্যায়ে বা কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা কত মূল্যের ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে? স্থানীয় পর্যায়ের ক্রয় সিদ্ধান্ত সবসময় স্থানীয় পর্যায় থেকে নেওয়া হয় কিনা। তা না হলে, কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে কখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়? ক্রয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কোনো কমিটি থাকলে এই কমিটির মেয়াদ কতদিনের? কমিটিতে কারা রয়েছেন?

ক্ষেত্র ২: ই-জিপি প্রক্রিয়া

৮. **ই-জিপি'তে নিবন্ধন** - সব ব্যবহারকারীদের (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার, উন্নয়ন অংশীদার, অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদার, মূল্যায়ন কমিটি) ই-জিপি ব্যবস্থায় নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্রয় সংক্রান্ত কোন কোন অংশীজন ই-জিপি'তে নিবন্ধিত। নিবন্ধিত হলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়। নিবন্ধনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ কী কী। কোনো অংশীদার নিবন্ধিত না হলে কেন হয় নি। নিবন্ধিত না হওয়ার ফলে কী কী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়।

---

[৪] যেসব গবেষণা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ক্ষেত্র ও নির্দেশক ঠিক করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে জেরেমি পোপ, *কনফ্রনটিং করাপশন: দি এলিমেন্টস অব আ ন্যাশনাল ইন্টেগ্রিটি সিস্টেম*, টিআই সোর্সবুক ২০০০, পৃ. ২০৫-২২০; সিপিটিইউ, আইএমইডি, 'বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) গাইডলাইন ২০১১'।

৯. **টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া** - বিধি অনুযায়ী টেন্ডার ওপেনিং কমিটি টেন্ডার খোলার আগে ঠিকাদারের পরিচয় গোপন থাকবে। ই-জিপি ব্যবস্থার মাধ্যমে টেন্ডার ওপেনিং শিট তৈরি হবে। দুই সদস্যের কমিটি গঠন করতে হবে, যাদের একজন অবশ্যই ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান থেকে আসবে। এক্ষেত্রে জানতে হবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার ওপেনিং কমিটি গঠন করা হয় কিনা। টেন্ডার ওপেনিং কমিটিতে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধি থাকে কিনা। টেন্ডার ওপেনিং কমিটি প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি করে কিনা। ই-জিপি পোর্টালে সব ফরম ও টেমপ্লেট পাওয়া যায় কিনা। টেন্ডার ওপেনিং কমিটি টেন্ডার খোলার আগে ঠিকাদারের পরিচয় গোপন থাকে কিনা।

১০. **প্রাক টেন্ডার মিটিং** - গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে টেন্ডারে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে প্রাক-টেন্ডার মিটিং করতে হয়। প্রাক-টেন্ডার মিটিংয়ে অংশগ্রহণকারীদের নাম অন্য ঠিকাদারদের জানানো হয় না। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য বিষয় হচ্ছে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রাক-টেন্ডার মিটিং করা হয় কিনা। এই প্রাক-টেন্ডার মিটিংয়ে কারা অংশগ্রহণ করছে তা সবাই জানে কিনা।

১১. **ই-বিজ্ঞাপন** - বিধি অনুযায়ী ই-জিপি পোর্টালে ক্রয় সংক্রান্ত সব বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হয়। এজন্য জানতে হবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্রয় সংক্রান্ত সব বিজ্ঞপ্তি ই-জিপি পোর্টালে প্রকাশ করা হয় কিনা। ক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন আর কী কী মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। নিবন্ধিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কাছে ক্রয় সংক্রান্ত কোনো বিজ্ঞাপন পাঠানোর ব্যবস্থা রয়েছে কিনা।

১২. **দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া** - বিধি অনুযায়ী টিইসি সর্বোচ্চ তিনজন সদস্য দ্বারা গঠিত হবে, যাদের দুইজন ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান থেকে আসবে। কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ক্রয় কার্য-প্রণালী অনুযায়ী সিস্টেমের মধ্য দিয়ে পাঠানো হবে, এক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ে সরাসরি যোগাযোগ প্রয়োজনীয় নয়। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য বিষয় হচ্ছে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি গঠন করা হয় কিনা। এই কমিটিতে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান থেকে কতজন প্রতিনিধি থাকে। কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট) ক্রয় কার্য-প্রণালী অনুযায়ী সিস্টেমের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় কিনা।

১৩. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ** - ই-জিপি পোর্টালে ক্রয় সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে হয়। এক্ষেত্রে ক্রয় সিদ্ধান্ত (কে বা কোন প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ পায় তাদের তালিকা) সিপিটিউ অথবা ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় কিনা। যেসব প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ পায় না সেক্ষেত্রে কেন কার্যাদেশ পেলো না তার কারণ উল্লেখ করা হয় কিনা।

ক্ষেত্র ৩: ই-জিপি ব্যবস্থাপনা

১৪. **ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা** - বিধি অনুযায়ী ই-জিপি ব্যবস্থায় কর্ম-পরিকল্পনা দাখিল করতে হয়। দর-কষাকষি, চুক্তি স্বাক্ষর ও চুক্তি বাস্তবায়নের সময় কর্ম-পরিকল্পনার অনুমোদন ও সংশোধন করা হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে ঠিকাদার ই-জিপি চুক্তি ব্যবস্থাপনা টুলস ব্যবহার করে। ফলে জানা প্রয়োজন গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদার ই-জিপি ব্যবস্থায় কর্ম-পরিকল্পনা দাখিল করে কিনা। নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে ঠিকাদার ই-জিপি চুক্তি ব্যবস্থাপনা টুলস ব্যবহার করে কিনা, না করলে কেন করে না? সেক্ষেত্রে কিভাবে প্রতিবেদন তৈরি করে? তদারকির ক্ষেত্রে ই-ব্যবস্থাপনায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান ক্রয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য রাখে কিনা। ই-ব্যবস্থাপনায় সব ডকুমেন্ট আর্কাইভে রাখা হয় কিনা।

১৫. **কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি** - দর-কষাকষি, চুক্তি স্বাক্ষর ও চুক্তি বাস্তবায়নের সময় কর্ম-পরিকল্পনার অনুমোদন ও সংশোধন করা হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে ঠিকাদার ই-জিপি চুক্তি ব্যবস্থাপনা টুলস ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে জানার বিষয় হচ্ছে ই-জিপি প্রক্রিয়ায় কাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার কোনো পদ্ধতি রয়েছে কিনা। চুক্তি অনুযায়ী কাজ যথাযথভাবে করা হয় কিনা তা কি পর্যবেক্ষণ করা হয়? যেসব ডকুমেন্ট ই-জিপি'র সাথে সম্পর্কিত, যেমন পরিদর্শন প্রতিবেদন, ফটোগ্রাফ প্রভৃতি কি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়েবসাইটে আপলোড করেন? যখন কাজের ক্ষেত্রে সংশোধনের প্রয়োজন তখন অটো অ্যালার্টের ব্যবস্থা কি ই-জিপি প্রক্রিয়ায় রয়েছে? কাজ সম্পাদনের পরিকল্পনা, কে কাজ করছে, কখন কাজের কোন অংশ শেষ হবে সে সম্পর্কে ই-জিপি প্রক্রিয়ায় কি বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে?

ক্ষেত্র ৪: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

১৬. **অভিযোগ নিষ্পত্তি** - বিধি অনুযায়ী সব সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে জানতে হবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ক্রয় সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা আছে কিনা। থাকলে কী প্রক্রিয়ায় অভিযোগ গ্রহণ করা হয়? অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয় কিভাবে? অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা না থাকলে কেন নেই?

১৭. **নিরীক্ষা** - সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা হয় কিনা। হলে কতদিন পর পর, এবং কোন কোন কাজের নিরীক্ষা হয়? নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় কিনা। নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সাধারণ জনগণের অভিগম্যতা রয়েছে কিনা। নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আপত্তি নিষ্পত্তি কতদিনের মধ্যে করা হয়?

১৮. **সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ** - সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি ১৯৭৯ অনুযায়ী সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর সম্পদের বিবরণী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে জানা প্রয়োজন গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে সম্পদের বিবরণী দাখিল করেন কিনা। সম্পদের বিবরণী দাখিল করলে কী প্রক্রিয়ায় ও কতদিন পরপর করেন? এই সম্পদের বিবরণী সাধারণ জনগণের কাছে প্রকাশ করা হয় কিনা, বা জনগণের প্রবেশাধিকার রয়েছে কিনা। প্রকাশ করা হলে, কোন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়? কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ, আয়ের পরিমাণ, এবং জীবন-যাপন পর্যবেক্ষণ করার কোনো পদ্ধতি রয়েছে কিনা।

ক্ষেত্র ৫: কার্যকরতা

১৯. **ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে দুর্নীতি হ্রাস** - ই-প্রকিউরমেন্ট প্রচলনের কারণে দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে কিনা সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ধারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান পাওয়ার জন্য এই নির্দেশক। সেক্ষেত্রে জানতে হবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ই-প্রকিউরমেন্ট প্রচলনের কারণে দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে কিনা সে বিষয়ে ঠিকাদারদের অভিজ্ঞতা বা ধারণা কী? দুর্নীতি হ্রাস না পেয়ে থাকলে কেন? কিভাবে এ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি হচ্ছে? গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ই-প্রকিউরমেন্ট প্রচলনের কারণে ঠিকাদার নির্বাচন আরও নিরপেক্ষ হয়েছে কি? উত্তর না হয়ে থাকলে এর কারণ কী? কিভাবে যথাযথ নিরপেক্ষভাবে ঠিকাদার নির্বাচন সম্ভব হচ্ছে না? গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ই-প্রকিউরমেন্টের কারণে দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে কিনা সে বিষয়ে সাধারণ জনগণের ধারণা কি? দুর্নীতি হ্রাস না পেয়ে থাকলে কেন? কিভাবে এ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি হচ্ছে?

২০. **ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে কাজের মান বৃদ্ধি** - ই-প্রকিউরমেন্ট প্রচলনের কারণে কাজের মান বেড়েছে কিনা সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ধারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান পাওয়ার জন্য এই নির্দেশক। সেক্ষেত্রে জানতে হবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ই-প্রকিউরমেন্ট প্রচলনের কারণে ঠিকাদারদের কাজের মান আরও বেড়েছে কিনা। না হলে কেন? কিভাবে আরও উন্নত মানের কাজ নিশ্চিত করা যায়? এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোনো উদ্যোগ আছে কি?

১.১১ স্কোরিং পদ্ধতি

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটি ক্ষেত্রের মোট স্কোর পাওয়ার জন্য ঐ ক্ষেত্রের সবগুলো নির্দেশকের স্কোর প্রথমে যোগ করা হয়েছে। এরপর ঐ ক্ষেত্রে যতগুলো নির্দেশক রয়েছে তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে এর শতকরা হার বের করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম ক্ষেত্রের (প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা) নির্দেশকগুলোর মোট স্কোর ৮ (দুইটি নির্দেশক ২ করে, চারটি নির্দেশক ১ করে এবং একটি নির্দেশক ০ পেয়েছে)। এই ক্ষেত্রের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোর ১৪ (৭টি নির্দেশক X প্রত্যেক নির্দেশকের সর্বোচ্চ স্কোর ২ ধরে)। কাজেই প্রথম ক্ষেত্রের চূড়ান্ত স্কোর ৮/১৪ X ১০০ = ৬০%।

আবার কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক স্কোর পাওয়ার জন্য সবগুলো নির্দেশকের মোট সর্বোচ্চ স্কোরের সাপেক্ষে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত মোট স্কোরের শতাংশ হিসাব করা হয়েছে। যেমন, ধরা যাক কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মোট স্কোর ১৭। সবগুলো নির্দেশকের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোর ৪০ (২০টি নির্দেশক X প্রত্যেক নির্দেশকের সর্বোচ্চ স্কোর ২ ধরে)। কাজেই এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মোট স্কোর হবে ১৭/৪০ X ১০০ = ৪২%।

সবশেষে প্রতিষ্ঠানগুলোর স্কোর অনুযায়ী গ্রেডিং করা হয়েছে। এই গ্রেডিং অনুযায়ী স্কোর ৮১% বা তার বেশি হলে 'ভালো', ৬১%-৮০% হলে 'সন্তোষজনক', ৪১%-৬০% হলে 'ঘাটতিপূর্ণ', এবং ৪০% এর নিচে হলে 'উদ্বেগজনক' হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছে।

১.১২ তথ্য সংগ্রহের সময়

গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ২০১৯ এর জুলাই থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে।

১.১৩ প্রতিবেদনের কাঠামো

এই প্রতিবেদন পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের ই-জিপি সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নির্দেশিকা, এবং ই-জিপি ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কাঠামো নিয়ে আলেচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বিশেষকরে এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, ক্রয়ের ধরন, ক্রয়ের বাজেট (বরাদ্দ, ব্যয়), এবং ক্রয় প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ই-জিপি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। এখানে প্রত্যেক নির্দেশকের বিপরীতে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর স্কোর ও তার ব্যাখ্যা, যেমন কোন প্রতিষ্ঠান কী চর্চা করছে, আইন ও বিধি কতটুকু মেনে চলছে, কোথায় ব্যত্যয় ঘটছে এবং কেন - তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সবগুলো নির্দেশকের বিপরীতে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক স্কোর ও তুলনামূলক স্কোর ও তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সবশেষে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ই-জিপি'তে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সুশাসনের ঘাটতির কারণ পর্যালোচনা এবং তার ভিত্তিতে সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে।

সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং ক্রয়কাজে অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি সম-আচরণ এবং অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য আইন, বিধি ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের ক্রয় সংক্রান্ত আইনি কাঠামো এবং ই-জিপি ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২.১ ই-জিপি'র ধারণা

বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ে দুর্নীতি[৪৩] একটি প্রধান সমস্যা। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ে দুর্নীতিকে প্রধান 'আলোচিত বিষয়'[৪৪] বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। ক্রয় কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম সংগঠিত হয়, যেমন দরপত্র শিডিউল জমা দিতে বাধা, ক্রয় নিয়ন্ত্রণের জন্য সিন্ডিকেট গঠন, দরপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য সন্ত্রাসী বাহিনীর ব্যবহার, দ্বিগুণ দামে নিম্নমানের জিনিস ক্রয়, ক্রয় প্রস্তাবে বেশি দাম দেখানো, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা দফতরের কর্মকর্তাদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব প্রভৃতি। এর ফলে সরকারি ক্রয় জনস্বার্থ-কেন্দ্রিক না হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ-কেন্দ্রিক হয়। তবে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম দূর করে সরকারি ক্রয়কে আরও জবাবদিহিতার মধ্যে আনার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলা হয়।[৪৫] এর ধারাবাহিকতায় ই-জিপি ধারণার উদ্ভব। তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ক্রয় পদ্ধতি[৪৬] ক্রয় কার্যক্রমকে দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ এবং প্রতিযোগিতামূলক করবে বলে ধারণা করা হয়।

ব্যবসা থেকে ব্যবসা, ব্যবসায়ের মাধ্যমে ভোক্তা বা ব্যবসা থেকে সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ, কাজ ও পরিষেবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন করার ধারণা হচ্ছে ই-প্রকিউরমেন্ট। মার্কিন প্রতিষ্ঠান আইবিএম ২০০০ সালে ই-প্রকিউরমেন্টের ধারণা প্রথম ব্যবহার করে। এই ব্যবস্থা আইবিএম-এর মেক্সিকোতে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম ল্যাপটপ উৎপাদনকারী প্ল্যান্টের জটিল ক্রয় পদ্ধতি সহজ করার জন্য তৈরি করা হয়। এই ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার তিনবছর পরে সংস্থাটি জার্মানিতে এটি ব্যবহার করে এবং পরে বিশ্বের অন্যান্য সংস্থাগুলির কাছে লাইসেন্স ব্যবহার করে বিক্রি করে। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে একটি নির্দেশনার মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ে ই-প্রকিউরমেন্ট প্রথম প্রবর্তন করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। ২০১৪ সালে এই নির্দেশনা সংশোধনের মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছ ও সমান সুযোগের একটি কাঠামো তৈরি করা হয়। এর মধ্যে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা, ক্রয়ের প্রক্রিয়ার মানদণ্ড ঠিক করা, ইলেকট্রনিক দরপত্র দাখিল প্রক্রিয়া, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আন্তর্জাতিকভাবেও সরকারি খাতে ই-প্রকিউরমেন্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ইইউ-এর পাশাপাশি যেসব দেশে ই-প্রকিউরমেন্ট চালু হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ, মঙ্গোলিয়া, ইউক্রেন, ভারত, সিঙ্গাপুর, এস্তোনিয়া, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া।[৪৭]

২.২ ই-জিপি'র প্রবর্তন

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট-২' এর আওতায় ২০১১ সালে ইলেকট্রনিক সরকারি ক্রয় পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সিপিটিইউ কর্তৃক তৈরি ও পরিচালিত জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টাল (http://eprocure.gov.bd) এর মাধ্যমে ই-জিপি'র কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরকারের ক্রয়কারী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান ই-জিপি ওয়েব পোর্টালে প্রবেশ করতে পারে। ই-জিপি সিস্টেমটি সরকারের ক্রয়কারী সংস্থা (পিএ) এবং ক্রয়কারীসমূহের (পিই) ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য একটি অনলাইন প্লাটফর্ম। একটি জাতীয় পোর্টাল হিসেবে ই-জিপি সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে, যেখান থেকে এবং যার মাধ্যমে ক্রয়কারী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরাপদ ওয়েব ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করে যাবতীয় ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারবে। এই ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, দরপত্র আহবান করা, প্রস্তাবের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন, কোটেশনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন, দরপত্র/আবেদন/প্রস্তাব তৈরি, জমা, উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন, চুক্তি সম্পাদন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, চুক্তি ব্যবস্থপনা, আর্থিক লেনদেন, ইনফরমেশন সিস্টেমের প্রধান প্রধান নির্দেশিকার (Key indicators) মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং সংশোধন করা যায়।[৪৮] এই পোর্টালের মাধ্যমে

---

[৪৩] বিবিসি বাংলা, 'বালিশ এবং পর্দা কেনায় দুর্নীতি নিয়ে কৃষিমন্ত্রী রাজ্জাক: চড়া রাজনৈতিক মূল্য দিতে হবে', ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯, https://www.bbc.com/bengali/news-49651086, (১৬ জানুয়ারি ২০২০); প্রথম আলো, 'পাতানো লটারির তদন্ত হোক', ২২ ডিসেম্বর ২০১১, http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2011-12-22/news/210509 (২ ডিসেম্বর ২০১৯); কালের কণ্ঠ, 'কৃষকের ধান ক্রয়ে কোনো দুর্নীতি সহ্য করা হবে না', ১২ জানুয়ারি ২০২০, https://www.kalerkantho.com/print-edition/priyo-desh/2020/01/12/861371 (২৯ জানুয়ারি ২০২০); ডিবিসি নিউজ, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন ক্রয়ে দুর্নীতি', ৬ ডিসেম্বর ২০১৯, https://dbcnews.tv/news/ (২৮ ডিসেম্বর ২০১৯)।

[৪৪] বাংলা ট্রিবিউন, 'সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ে দুর্নীতিই সবচেয়ে আলোচিত বিষয়: দুদক চেয়ারম্যান', ২ ডিসেম্বর ২০১৯, https://www.banglatribune.com/others/news/597360/ (২৮ ডিসেম্বর ২০১৯)।

[৪৫] এস এ টিভি, 'ধান ক্রয়ে কোনো দুর্নীতি সহ্য করা হবে না', ১১ জানুয়ারি ২০২০, https://www.satv.tv/ (২৯ জানুয়ারি ২০২০)।

[৪৬] বিডি নিউজ, 'সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি বন্ধ করবে ইজিপি: প্রধানমন্ত্রী', ই- জিপি'র মাধ্যমে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আরও বলেন, ই-জিপি চালুর মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং বন্ধ হবে দুর্নীতি। ২ জুন ২০১১, https://bangla.bdnews24.com/politics/article501167.bdnews (২৮ ডিসেম্বর ২০১৯)।

[৪৭] https://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement (৯ আগস্ট ২০২০)।

[৪৮] ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট, https://www.eprocure.gov.bd/FAQ.jsp?lang=bn_IN, (২ সেপ্টেম্বর ২০১৯)।

দরপত্রের সব কাজই অনলাইনে করা হয়। এছাড়া ই-দরপত্রায়নে ই-পেমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে। এ জন্য ৪৬টি ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে।[৪৯]

প্রথম পর্যায়ে চারটি ক্রয়কারী সংস্থার (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড) ১৬টি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে এবং সিপিটিইউ'তে পরীক্ষামূলকভাবে ই-জিপি চালু করা হয়। পর্যায়ক্রমে এই সিস্টেম চারটি ক্রয়কারী সংস্থার জেলা শহর পর্যন্ত ২৯৫টি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে (পিই) বিস্তৃত করা হয়। পরবর্তীতে দেশের সকল সরকারি ক্রয় সংস্থার অধীনস্থ পিই'তে ই-জিপি'র অধীনে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করার কাজ চলমান রয়েছে।

সিপিটিইউ'তে এখন ২৫টি স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্টস (এসটিডি) রয়েছে। শিগগিরই ই-জিপি পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক দরপত্র ও সিএমএস চালু করা হবে। অন্যান্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ) হিসেবে সিপিটিইউ'র পুনর্গঠন, বিপিপিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্তকরণ, ই-জিপি'র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, নিষ্পত্তি নীতি, টেকসই সরকারি ক্রয়কে আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা, এবং আরও ১২টি এসটিডি বাংলায় তৈরি করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।[৫০]

ই-জিপি-তে ২২ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত নিবন্ধিত হয়েছে ৪৭টি মন্ত্রণালয়, ২৭টি বিভাগ, ১,৩৬৫টি সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (যার মধ্যে ১,৩৪৩টি ই-জিপির আওতায়), এবং ৭৪,৩৯৫টি দরপত্রদাতা। ২০২০ সালের ২২ জুলাই ই-জিপি'তে দরপত্র আহবানের সংখ্যা চার লাখ ১১০টিতে পৌঁছেছে। একইসাথে ই-জিপিতে আহবানকৃত দরপত্রের মোট মূল্যমান দাঁড়িয়েছে চার লাখ ১০ হাজার কোটি টাকায়।[৫১] প্রচলনের পর থেকে মোট ক্রয়ের ৫৫ ভাগের বেশিই ই-জিপি'র মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। এটি সময় ও ব্যয় হ্রাস করছে বলে দাবি করা হয়।[৫২]

বাংলাদেশে এখন ৫৯ জন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রশিক্ষক রয়েছেন; ৩০ হাজারেরও বেশি ব্যক্তি (কর্মকর্তা, দরপত্রদাতা, সাংবাদিক, ব্যাংক-কর্মী) এ পর্যন্ত ই-জিপি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে সিপিটিইউ বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় আরও সংস্কার ও ই-জিপি সম্প্রসারণের জন্য ডিআইএমএপিপি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে, যার প্রধান কয়েকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে সক্ষমতা বিকাশ ও পেশাদারত্ব বৃদ্ধি, নাগরিকের অংশগ্রহণ, এবং বিপিপিএ প্রতিষ্ঠা। একটি নির্ধারিত ২৪/৭ হেল্প-ডেস্ক (১৬৫৭৫) সিপিটিইউ এবং ১০টি নির্বাচিত সরকারি খাতের সংস্থায় কাজ করছে। নাগরিকদের জন্য বাংলায় একটি নাগরিক পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সরকারি ক্রয় সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে একটি কেন্দ্রীয় সরকার-দরদাতা ফোরাম চালু করা হয়েছে যা ৬৪টি জেলায় গঠিত ৬৪ জিটিএফ-এর সবগুলোকে সংযুক্ত করবে।[৫৩]

মূল্য ও পরিমাণ উভয় দিক থেকেই গত কয়েক বছরে আইসিটি-ভিত্তিক সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। সরকারি ক্রয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ বর্তমানে ই-জিপি ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।[৫৪] ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ই-জিপি'তে পরিচালিত সরকারি ক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ঐ অর্থবছরে সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি'তে পরিচালিত ক্রয়ের অংশ ৬২%।[৫৫] দশম জাতীয় সংসদের প্রধানমন্ত্রী সংসদ অধিবেশনে তাঁর সমাপনী বক্তব্যে জানান যে সরকারি ক্রয়ে ই-জিপির অন্তর্ভুক্তি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করেছে। তাঁর মতে এর ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়েছে - বর্তমানে দরপত্রপ্রতি ১১ জন অংশগ্রহণ করছে যেখানে এই ব্যবস্থা প্রচলনের আগে ছিল দরপত্রপ্রতি চারজন। দরপত্রের মেয়াদের মধ্যে ৯৩ শতাংশ কার্যাদেশ দেওয়া হচ্ছে।[৫৬]

২.৩ ই-জিপি'র ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কাঠামো

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের একটি স্থায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠান। সরকারি ক্রয়ে সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে এবং একটি সুষ্ঠু ও কার্যকর ক্রয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে সিপিটিইউ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬-এর ৬৭ ধারায় বর্ণিত (ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এই আইনের বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; (খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ; (গ) নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্য পূরণে সিপিটিইউ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

২.৩.১. সিপিটিইউ-এর দায়িত্ব[৫৭]

---

[৪৯] প্রকিউরমেন্ট বিডি, 'বেশিরভাগ সরকারি কেনাকাটা এখন ইজিপির মাধ্যমে হচ্ছে', ৮ জুলাই ২০১৯, https://procurementbd.com/more-than-50-procurement-online/ (৮ নভেম্বর ২০১৯)।

[৫০] ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট, https://www.eprocure.gov.bd/FAQ.jsp?lang=bn_IN, (২ সেপ্টেম্বর ২০১৯)।

[৫১] প্রকিউরমেন্ট বিডি, 'ই-জিপি'তে নতুন রেকর্ড', ২৩ জুলাই ২০২০, https://procurementbd.com/new-record-in-e-gp/ (১০ আগস্ট ২০২০)।

[৫২] ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট, https://www.eprocure.gov.bd/FAQ.jsp?lang=bn_IN, (২ সেপ্টেম্বর ২০১৯)।

[৫৩] *প্রাগুক্ত*।

[৫৪] প্রকিউরমেন্ট বিডি, 'বেশিরভাগ সরকারি কেনাকাটা এখন ইজিপির মাধ্যমে হচ্ছে', ৮ জুলাই ২০১৯, https://procurementbd.com/more-than-50-procurement-online/ (৮ নভেম্বর ২০১৯)।

[৫৫] বিশ্বব্যাংক, ২০২০, 'অ্যাসেসমেন্ট অব বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম', © বিশ্ব ব্যাংক।

[৫৬] *প্রাগুক্ত*।

[৫৭] সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট, https://bangla.cptu.gov.bd/about-cptu/central-procurement-technical-unit.html, (২ সেপ্টেম্বর ২০১৯)।

সিপিটিইউ-এর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে -

- সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬ এবং সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ এর আওতায় সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্রয় পরিবীক্ষণ ও ডিজিটাইশন তথা ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বাস্তবায়ন করা;
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন/বিধির প্রয়োগ সহজীকরণ, সংস্কার সাধন কিংবা যুগোপযোগীকরণ করা;
- ক্রয়কারী দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি, দরদাতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জনগণের মধ্যে সরকারি ক্রয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করা;
- ই-জিপি পোর্টালের কার্যক্রম পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা;
- সীমিত পরিসরে সরকারি ক্রয় সম্পর্কিত আইন/বিধি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা;
- এসটিডি গাইডলাইন, সার্কুলার জারি এবং বিভিন্ন দপ্তর/ঠিকাদার/ব্যক্তির অনুরোধে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কে মতামত প্রদান করা;
- পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ প্রতিপালনের মাধ্যমে দেশে পাবলিক প্রকিউরমেন্টে উচ্চশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি করা; এবং
- দেশীয় বাস্তবতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য দেশের ক্রয় ব্যবস্থায় বিদ্যমান ভালো দিকগুলো গ্রহণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিং বজায় রাখা।

২.৩.২. সিপিটিইউ এর সাংগঠনিক কাঠামো[৫৮]

আইএমইডি'র সচিবের অধীনে সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক তাঁর কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালকের অধীনে তিনজন পরিচালক, ছয়জন উপপরিচালক এবং চারজন সহকারী পরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া সিস্টেম অ্যানালিস্ট, প্রোগামার, সহকারী প্রোগ্রামারসহ সর্বমোট ৩৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এ ইউনিটে কর্মরত যার মধ্যে ২৫টি পদ সরকারের রাজস্ব বাজেটের অধীন।

২.৩.৩. ই-জিপি কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপ[৫৯]

দুই ধাপে ই-জিপি সিস্টেম বাস্তবায়ন করার বিষয়টি ই-জিপি সংক্রান্ত অনুমোদিত নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে - দরপত্রায়ন পদ্ধতি এবং ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।

ই-দরপত্রায়ন পদ্ধতি: ই-দরপত্রায়ন পদ্ধতিতে কেন্দ্রিয়ভাবে নিবন্ধন থেকে শুরু করে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, দরপত্রদাতার প্রতি নির্দেশনা, দরপত্র দলিল বিক্রয়, অন-লাইন প্রাক-দরপত্র সভা পরিচালনা, দরপত্র জামানত গ্রহণ, দরপত্র জমাদান, উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন, দর-কষাকষি এবং ক্রয়াদেশ জারিসহ দরপত্র প্রক্রিয়া করার পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি: ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে কর্ম পরিকল্পনা জমাদান, মাইলফলক নির্ধারণ, অগ্রগতি শনাক্তকরণ, পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন তৈরি, গুণগত মান পরীক্ষা, চলমান বিল তৈরি, ভেন্ডরের রেটিং এবং কার্যসমাপ্তির সনদ তৈরিসহ চুক্তি ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত। তবে ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম এখনো শুরু হয় নি।

২.৪ ই-জিপি সংক্রান্ত আইন ও বিধি, নির্দেশিকা

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুসারে 'ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে।[৬০] এই নির্দেশমালায় প্রধানত যেসব বিষয় নিশ্চিত করার জন্য বলা হয়েছে তা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে।

২.৪.১. কেন্দ্রিয় নিবন্ধন পদ্ধতি[৬১]

ই-জিপি পদ্ধতি অনুযায়ী দরপত্রদাতা, পরামর্শক, ক্রয়কারী, মিডিয়া, পেমেন্ট সেবা প্রদানকারী ও উন্নয়ন সহযোগীদের নিবন্ধন করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সিপিটিইউ/আইএমইডি ব্যবহারকারীর নিবন্ধন ফিসহ যেকোনো ধরনের ফি আরোপ বা মওকুফ করতে পারবে। বর্তমানে দেশীয় দরপত্রদাতা/ পরামর্শকদের জন্য নিবন্ধন ফি হিসেবে বার্ষিক ৫,০০০ টাকা এবং নিবন্ধন নবায়নের জন্য ২,০০০ টাকা ফি ধার্য করা হয়েছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ব্যবহারকারীদের নিবন্ধনের জন্য ২০০ মার্কিন ডলার এবং বার্ষিক নবায়ন ফি হিসেবে ১০০ মার্কিন ডলার ধার্য করা হয়েছে। ই-জিপি সিস্টেমে লেনদেন, নির্দিষ্ট সময়ান্তে নবায়ন, অতিরিক্ত ধারণক্ষমতা সৃষ্টি, ই-জিপি সিস্টেমের নির্দিষ্ট ফিচার/মডিউল ব্যবহার, চালু রাখা, সংশোধন কিংবা পরিচালনার জন্য সিপিটিইউ/আইএমইডি অতিরিক্ত ফি ধার্য করতে পারবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সিপিটিইউ/ আইএমইডি ই-জিপি সিস্টেম ব্যবহার এবং ভবিষ্যতে তা সচল এবং কর্মক্ষম রাখার জন্য উপযুক্ত ফি ধার্য বা মওকুফ করতে পারবে।

---

[৫৮] সিপিটিইউ, https://bangla.cptu.gov.bd/about-cptu/organogram.html (২ সেপ্টেম্বর ২০১৯)।

[৫৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টাল, https://www.eprocure.gov.bd/Index.jsp?lang=bn_IN (২ সেপ্টেম্বর ২০১৯)।

[৬০] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬-এ বলা হয়েছে "ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে সরকারি ক্রয়- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরনকল্পে, এই আইনের অধীন কোন বা সকল সরকারী ক্রয় ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যাইবে" (ধারা ৬৫)। অন্যদিকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-তে বলা হয়েছে, "ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে সরকারি ক্রয় আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণক্রমে যে কোন বা সকল সরকারি ক্রয় ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতির ব্যবহার করিয়া সম্পন্ন করা যাইবে" (বিধি ১২৮)।

[৬১] *ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা ২০১১*, ধারা ৩.২।

নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য ও ডকুমেন্ট সিপিটিইউ থেকে প্রাথমিক যাচাইয়ের পর নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। শুধু গণমাধ্যম ছাড়া সব প্রতিষ্ঠানকে ই-জিপি নিবন্ধন ফি জমার রশিদ ই-জিপি সিস্টেমে আপলোড করতে হয়। এছাড়া দরপত্রদাতা/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (দেশীয়, আন্তর্জাতিক), সরকারি মালিকানাধীন (জাতীয়) এন্টারপ্রাইজ, ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক), গণমাধ্যমকে (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) নিবন্ধিত হওয়ার জন্য কোম্পানি নিবন্ধনের কাগজপত্র, ট্রেড লাইসেন্স, বৈধ করদাতা শনাক্তকরণ নম্বরের (TIN) সনদ প্রভৃতি প্রয়োজন। সরকারি মালিকানাধীন (জাতীয়) এন্টারপ্রাইজ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রমাণের জন্য সরকারি আদেশ, অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত সনদ, অথরাইজড অ্যাডমিন -এর জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট প্রভৃতি এবং ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) ও গণমাধ্যমের (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) জন্য পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট আকারে ছবি প্রভৃতি প্রয়োজন (বিস্তারিত সারণি ৪)।

সারণি ৪: ই-জিপি'তে নিবন্ধনের জন্য বিভিন্ন অংশীজনের জন্য প্রযোজ্য নথি/ সনদ

অংশীজন	দেশীয় দরপত্রদাতা/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	আন্তর্জাতিক দরপত্রদাতা/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	সরকারি মালিকানাধীন (জাতীয়) এন্টারপ্রাইজ	ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)	গণমাধ্যম (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)
আবশ্যিক কাগজপত্র	কোম্পানি ইনকর্পোরেশন সনদ (কোম্পানির ক্ষেত্রে) অথবা কোম্পানি নিবন্ধনের কাগজপত্র	কোম্পানি ইনকর্পোরেশন সনদ (কোম্পানির ক্ষেত্রে) অথবা কোম্পানি নিবন্ধনের কাগজপত্র	সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রমাণের জন্য সরকারি আদেশ	জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি অথবা পাসপোর্ট	গণমাধ্যম কোম্পানি/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র
	ট্রেড লাইসেন্স	ট্রেড লাইসেন্স	অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত সনদ	ই-জিপি নিবন্ধন ফি জমার রশিদ	জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি অথবা পাসপোর্ট
	বৈধ করদাতা শনাক্তকরণ নম্বরের (TIN) সনদ	বৈধ করদাতা শনাক্তকরণ নম্বরের (TIN) সনদ	অথরাইজড অ্যাডমিনের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট	এক (১) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি	এক (১) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি
	মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত (VAT) সনদ	মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত (VAT/ Goods and Service Tax (GST) সনদ	অথরাইজড অ্যাডমিনের এক (১) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি		
	ফার্ম/ কোম্পানি অ্যাড মিনের জন্য কোম্পানি/ ফার্মের মালিক থেকে অনুমতিপত্র	ফার্ম/ কোম্পানি অ্যাড মিনের জন্য কোম্পানি/ ফার্মের মালিক থেকে অনুমতিপত্র	অথরাইজড অ্যাডমিনের জন্য অনুমতিপত্র		
	অথরাইজড অ্যাডমিনের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট	অথরাইজড অ্যাডমিনের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট	ই-জিপি নিবন্ধন ফি জমার রশিদ		
	ই-জিপি নিবন্ধন ফি জমার রশিদ	ই-জিপি নিবন্ধন ফি জমার রশিদ			
	অথরাইজড অ্যাডমিনের এক (১) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি	অথরাইজড অ্যাডমিনের এক (১) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি			

২.৪.২. বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা[৬২]

ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সকল ক্রয়কারীর জন্য বাধ্যতামূলক। উন্নয়ন প্রকল্পের (পূর্ণ মেয়াদকালের জন্য) অধীনে ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং রাজস্ব বাজেটের জন্য পূর্ণ মেয়াদকালের জন্য বছরভিত্তিক সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এই ক্রয় পরিকল্পনা সিপিটিইউ'র ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।[৬৩]

২.৪.৩. ই-বিজ্ঞপ্তি[৬৪]

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন তৈরি করে ই-জিপি পোর্টাল, সংবাদপত্র[৬৫] এবং বাণিজ্যিক দরপত্র পোর্টালে[৬৬] দরপত্র প্রকাশ করবে।

২.৪.৪. অন-লাইন প্রাক-দরপত্র সভা[৬৭]

[৬২] ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা, ধারা ৩.৩।
[৬৩] পিপিআর ২০০৮, ধারা ১৬; 'ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা', ধারা ৩ ও পরিশিষ্ট ২।
[৬৪] ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা, ধারা ৩.৫.১।
[৬৫] ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা, ধারা ৫।
[৬৬] বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, 'জাতীয় আইসিটি নীতি ২০০৯', অনুচ্ছেদ ৮২, http://www.bcs.org.bd/img/upload/page/11.pdf (১০ আগস্ট ২০২০)।
[৬৭] ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা, ধারা ৩.৫.৩।

নির্দিষ্ট সময় ও তারিখ অনুযায়ী অন-লাইন প্রাক-দরপত্র সভা আহ্বান করতে হবে। অন-লাইনে জমা হওয়া দরপত্রের সংখ্যা শুধুমাত্র ক্রয়কারী সংস্থা ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারবে না। দরপত্রদাতা দরপত্র সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্নের উত্তর/ব্যাখ্যা প্রাক-দরপত্র সভার আগে বা সভাকালীন ই-জিপি সিস্টেমের ড্যাশবোর্ডের অনলাইন চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন। ফ্যাক্স/ পোস্ট/ ই-মেইল বা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে কোনো প্রশ্ন বা প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ করা হবে না। প্রাক-দরপত্র সভা অনলাইনে পরিচালিত হবে এবং দরদাতাদের প্রশ্নের ব্যাখ্যা/ উত্তর ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হবে। যারা সংশ্লিষ্ট দরপত্র দলিল ক্রয় করেছেন, তারাই কেবল ড্যাশবোর্ডের বক্সের মধ্যে উত্তর পাবেন। যেসব দরদাতা ইলেকট্রনিক দরপত্র মিটিং-এ অংশগ্রহণ করবেন, তাদের নাম ই-জিপি সিস্টেম বা ক্রয়কারী অন্য কারও সাথে প্রকাশ করবে না।

২.৪.৫. দরপত্র উন্মুক্তকরণ প্রক্রিয়া[৬৮]

দুজন সদস্য নিয়ে দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি গঠন করা হয়, যাদের মধ্যে অবশ্যই একজনকে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে হবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ মুহূর্ত পার হওয়ার পরেই কেবল কোনো দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির সদস্য ই-জিপি সিস্টেমে লগ-ইন করতে পারবেন। উন্মুক্তকরণের পর ই-জিপি সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত টেবুলার ফর্মেটে 'উন্মুক্তকরণ শিট' তৈরি করে দিবে, যেখানে দরপত্রদাতাদের নাম, বিস্তারিত যোগাযোগের ঠিকানা, উদ্ধৃত মূল্য, মুদ্রার নাম, দরপত্র জমা দেওয়ার পর উঠিয়ে নেওয়া, কিংবা পরিবর্তন বা সংশোধন সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে। অংশগ্রহণকারী দরদাতা দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় ব্যক্তিগতভাবে বা অন-লাইনে উপস্থিত থাকতে পারবেন। প্রয়োজন হলে দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি তাদের পর্যবেক্ষণসহ 'উন্মুক্তকরণ শিট' অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের কাছে পাঠাতে পারবে। দরপত্র উন্মুক্ত করার সময় যদি কোনো দরদাতা ই-জিপি সিস্টেমে লগ-ইন করেন, তাহলে দরদাতার লগ-ইন তথ্যই দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি সভায় তার উপস্থিতি হিসেবে গণ্য হবে।

২.৪.৬. দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া[৬৯]

সর্বোচ্চ তিনজন সদস্য নিয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়, যাদের মধ্যে অবশ্যই দুজনকে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে হবে। ক্রয়কারী কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেওয়া সময়েই কেবল মূল্যায়ন কমিটির সদস্যরা ই-জিপি সিস্টেম ও দরপত্রে প্রবেশ করতে পারবেন। ই-জিপি সিস্টেম দরদাতাদের উদ্ধৃত মূল্য ও মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত নির্ণায়কের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তুলনামূলক ছক তৈরি করে দেবে। মূল্যায়ন কমিটি সকল তথ্য, তুলনামূলক ছকসহ তাদের মতামত ও সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং অন-লাইনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য পাঠাবে।

২.৪.৭. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া[৭০]

ক্রয়কারী ই-জিপি পদ্ধতিতে ক্রয় সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য আপলোড করবে, যার ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হবে।

২.৪.৮. নিরীক্ষা[৭১]

ই-জিপি পদ্ধতির মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরীক্ষক অনুমতিসাপেক্ষে ই-জিপি পদ্ধতির মাধ্যমে লগ অন করবে। নিরীক্ষা করা হয় এমন সকল তথ্য নিরীক্ষা ট্রায়াল ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হবে।

২.৪.৯. ই-পেমেন্ট পদ্ধতি[৭২]

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত তফসিলি ব্যাংকসমূহ/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইজিপি সিস্টেমের ফি গ্রহণের জন্য অনুমতি পাবে এবং ই-জিপি সিস্টেমে আর্থিক লেনদেন সম্পূর্ণ করতে পারবে। তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং অন্যান্য আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব সার্বক্ষণিক ও নিরাপদ ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে ই-জিপি সিস্টেমে নিরাপদ প্রবেশাধিকার পাবে এবং লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবে। নগদ/ পে-অর্ডার/ অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে, কিংবা দরদাতা ব্যাংকে গিয়ে ফি প্রদান করতে পারবেন। ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেনের পর ব্যাংক ই-জিপি সিস্টেমে তা হালনাগাদ করবে। ই-জিপি পেমেন্ট নেটওয়ার্কের ব্যাংকের মাধ্যমে নগদ/ ডিমান্ড ড্রাফট/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক অ্যাডভাইস বা ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে দরদাতার দরপত্র জামানত এবং কার্য সম্পাদন তৈরি করবে। পরবর্তীতে ব্যাংক ই-জিপি সিস্টেমে আর্থিক লেনদেন হালনাগাদ করবে। নিবন্ধন ফি, দরপত্র দলিল ফি এবং অন্যান্য ফি, আদায় দরপত্র জামানত গ্রহণ, জামানত অবমুক্তকরণ ও বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেন ই-পেমেন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

২.৪.১০. নিরাপত্তা[৭৩]

ই-জিপি পদ্ধতিতে সংরক্ষিত সকল তথ্যের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো তথ্য প্রকাশ করা যাবেনা। ই-স্বাক্ষর (হ্যাশ তৈরি/স্বাক্ষর), পিকেআই ভিত্তিক ডিজিটাল স্বাক্ষর, দরপত্র এনক্রিপশন/ডিক্রিপশন পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

---

[৬৮] ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা, ধারা ৩.৫.৬ ও পরিশিষ্ট ২।
[৬৯] ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা, ধারা ৩.৬ ও পরিশিষ্ট ২।
[৭০] ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা, ধারা ৩.৯.৫।
[৭১] ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা, ধারা ৩.৯.৬।
[৭২] ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা, ধারা ৩.৮.২।
[৭৩] ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা, ধারা ৩.৯.৬।

২.৪.১১. অভিযোগ নিরসন[৩৬]

সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬, সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে অভিযোগ নিরসন করা হবে।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বাংলাদেশে ই-জিপি'র জন্য যথাযথ আইনি ও প্রক্রিয়াগত কাঠামো বিদ্যমান। এই আইনি কাঠামোতে বিভিন্ন অংশীজনের নিবন্ধন পদ্ধতি, ক্রয় প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, ই-বিজ্ঞপ্তি, অন-লাইন প্রাক-দরপত্র সভা, দরপত্র উন্মুক্তকরণ প্রক্রিয়া, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, নিরীক্ষা, ই-পেমেন্ট পদ্ধতি, নিরাপত্তা প্রদান এবং অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাঠামো অনুযায়ী ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব বলে ধারণা করা যায়।

[৩৬] ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা, ধারা ৩.৬.৩।

এই অধ্যায়ে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চারটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, কার্যক্রম এবং ই-জিপি সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। চিত্র ৪-এ ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসব প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ দেখানো হয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ ছিল সড়ক ও জনপথ বিভাগের।

চিত্র ৪: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চারটি প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দ (কোটি টাকা)

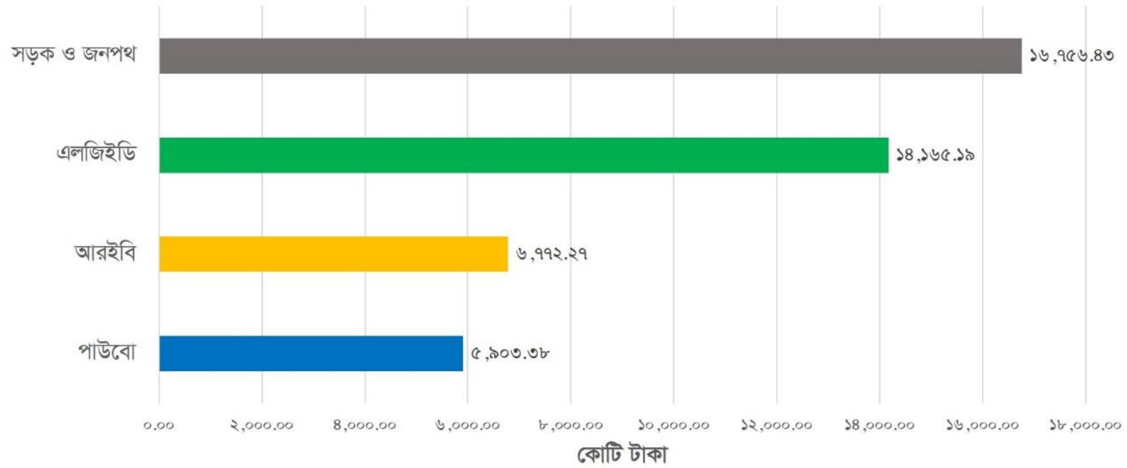

৩.১. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৩.১.১. প্রতিষ্ঠা[৭৫]

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৭ সনে জাতিসংঘের অধীনে গঠিত ক্রুগ মিশনের[৭৬] সুপারিশক্রমে ১৯৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) গঠন করা হয়, যার অধীনে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) পানি উইং হিসেবে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রধান সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ইপিওয়াপদা'র পানি অংশ একই কার্যক্রম নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সংস্কার ও পুনর্গঠনের ধারাবাহিকতায় জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ প্রণয়ন করা হয়।

৩.১.২. কার্যক্রম

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানি সম্পদের সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন, পানি সংক্রান্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের জপনমাল রক্ষা করে এবং সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জনগণের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করা পাউবো'র লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাউবো নিম্নের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

- নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রন, পানি নিস্কাশন সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোনো অবকাঠামো নির্মাণ;
- সেচ, মৎস্য চাষ, নৌ-পরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;
- ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;
- নদী অববাহিকা বা নিচু ভূমি উন্নয়ন, তথা ভরাট করে শিল্পপার্ক/ কারখানা/ আবাসন এলাকা/ বন্দর ইত্যাদি স্থাপনের পরিবেশ সৃষ্টিতে সেবা প্রদান;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা সেচ প্রকল্পসমূহের পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর গেট তৈরি, স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ও ব্যয়ন কার্য সম্পাদন;
- লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমণ; এবং

[৭৫] বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, https://www.bwdb.gov.bd/index.php/site/page/6d77-1f17-3398-c39b-879c-318e-fe07-40f1-7bbd-8020 (১০ আগস্ট ২০২০)।

[৭৬] ১৯৫৪, ১৯৫৫, এবং ১৯৫৬ সালে পর পর তিনবছর বন্যার কারণেই দেশের খাদ্য উৎপাদন কমে যায়। ফলে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী আমদানি করা হয়। তবে তা সত্ত্বেও তখন খাদ্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকারের অনুরোধে যুক্তরাষ্ট্র থেকে জে এ ক্রুগ-এর নেতৃত্বে একটি মিশন গঠন করা হয়।

- বিভিন্ন জলাবদ্ধতা দূরীকরণ/ খাল খনন প্রকল্পের কাজে সহায়তা প্রদান।

৩.১.৩.ক্রয়ের ধরন

এ প্রতিষ্ঠানে মূলত প্রকল্পের আওতায় কার্য, পণ্য ও সেবা ক্রয় করা হয়। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন উভয় বাজেটের অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

সারণি ৫: পাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা (২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর সময়ে)

অর্থবছর	প্রকল্পের সংখ্যা
২০১৯-২০২০	৮৯
২০১৮-২০১৯	১১১
২০১৭-২০১৮	৯৫
২০১৬-২০১৭	৮৯

উৎস: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য (১৮ অক্টোবর ২০১৯)।

৩.১.৪.ক্রয়ের বাজেট (বরাদ্দ, ব্যয়)

পাউবো সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। উন্নয়ন বাজেটের অধীনে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রত্যেক অর্থবছরে বাড়ছে বলে দেখা যায় (সারণি ৬)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের ৫,৯৭২.৭৬ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয় ৫,৭৪১.৫০ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুন্নয়ন বাজেট যথাক্রমে ১,৩৬৫.৬১ এবং ৭৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

সারণি ৬: পাউবো'র উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ (২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর সময়ে)

অর্থবছর	অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০১৯-২০২০	৫,৯৫২.৩৯
২০১৮-২০১৯	৫,৯৭২.৭৬
২০১৭-২০১৮	৪,৬৭৩.১৮
২০১৬-২০১৭	৩,৭৬০.৯০

উৎস: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য (১৮ অক্টোবর ২০১৯)।

৩.১.৫.ক্রয় প্রক্রিয়া

উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ক্রয়কার্য সম্পন্ন করে থাকে। এ সকল পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করার জন্য ই-জিপি এবং ম্যানুয়াল উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পাউবো'র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (৫৩.৯৩%), যার পরেই রয়েছে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (২৯.৩%) (সারণি ৭)। তবে এর সাথে জমি অধিগ্রহণেও সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে (৪.৪৯%)। উল্লেখ্য, একমাত্র উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতেই ই-জিপি ব্যবহার করা হয়েছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল বা নন ই-জিপি ক্রয় পদ্ধতির ব্যবহার হয়েছে (৪৬.০৭%)। এছাড়া একই অর্থবছরে অনুন্নয়ন বাজেটের ৩৩.৮৬% ই-জিপি ও ৬৬.১৪% নন ই-জিপি এর মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করে। সাংঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কেন্দ্রিয়, জোনাল, সার্কেল, মাঠ পর্যায় সহ সকল দপ্তর ক্রয়কারী হিসেবে ক্রয়কাজ সম্পন্ন করে।

সারণি ৭: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পাউবোতে উন্নয়ন বাজেটের অধীনে ধরন অনুযায়ী ক্রয়কার্য সম্পাদন করার পদ্ধতি

ক্রয় পদ্ধতির ধরন	ক্রয়ের শতাংশ	ক্রয়কার্য সম্পাদন করার পদ্ধতি
উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	৫৩.৯৩	ই-জিপি
উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	১২.২৮	ম্যানুয়াল
সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি	২৯.৩	ম্যানুয়াল
জমি অধিগ্রহণ (সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি)	৪.৪৯	ম্যানুয়াল

উৎস: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য (১৮ অক্টোবর ২০১৯)।

অন্যদিকে অনুন্নয়ন বাজেটের অধীনেও যেসব ক্রয় করা হয় তার মধ্যে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হলেও জরুরি ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে ম্যানুয়াল পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রয় করা হয়। ২০১৮-১৯ বছরের অনুন্নয়ন বাজেটের অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে নতুন কাজ ও বকেয়া পরিশোধের ক্ষেত্রে মোট প্রায় ৬৩% কাজ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে করা হয়েছে (সারণি ৮)।

সারণি ৮: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পাউবোতে অনুন্নয়ন বাজেটের অধীনে ধরন অনুযায়ী ক্রয়কার্য সম্পাদন করার পদ্ধতি

ক্রয় পদ্ধতির ধরন	শতাংশ	ক্রয়কার্য সম্পাদন করার পদ্ধতি
উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	৩৫.১২	ই-জিপি
	২৭.৮৪ (বকেয়া পরিশোধ)	ই-জিপি
সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (জরুরি)	২০	ম্যানুয়াল

সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (কাবিটা- হাওর এলাকা)	১৩.৮৬	ম্যানুয়াল
	৩.১৮ (আইসিটি)	ই-জিপি

উৎস: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য (১৮ অক্টোবর ২০১৯)।

৩.২. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

৩.২.১.প্রতিষ্ঠা

১৯৭০-এর দশকে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে একটি প্রকৌশল শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার মূল কার্যক্রম ছিল পল্লী পূর্ত কর্মসূচি (রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম) পর্যবেক্ষণ করা। পরবর্তীতে এই শাখার কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য ১৯৮২ সালে উন্নয়ন বাজেটের অধীনে 'ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইং' চালু করা হয়। ১৯৮৪ সালে ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইংকে রাজস্ব বাজেটের অধীনে 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো' হিসেবে রূপান্তর করা হয়। কাজের পরিধি, প্রশাসনিক কার্যাবলী এবং জনবল কাঠামো বৃদ্ধির কারণে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে ১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরোকে 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর' (এলজিইডি) হিসেবে উন্নীত করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া, গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এলজিইডি।[৭৭]

৩.২.২.কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এলজিইডি গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করলেও পরবর্তীতে এর কাজের পরিধি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এলজিইডি স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে তিনটি খাতে কাজ করে থাকে - পল্লী উন্নয়ন, ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন ও নগর উন্নয়ন। একইসঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা দেয় এলজিইডি।

সারণি ৯: খাতওয়ারি প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ড[৭৮]

গ্রামীণ অবকাঠামো	নগর অবকাঠামো	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন
▪ সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন ▪ সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ ▪ গ্রোথ সেন্টার/ হাটবাজার উন্নয়ন ▪ ঘাট/ জেটি নির্মাণ ▪ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ ▪ উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন এবং উপজেলা সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মাণ ▪ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ▪ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি	▪ সড়ক/ ফুটপাত নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ ▪ নর্দমা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ ▪ বাস/ ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ▪ কমিউনিটি ল্যাট্রিন /স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ ▪ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ▪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ▪ আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ পরিচালনা	▪ স্লুইস গেট নির্মাণ ▪ রাবার ড্যাম নির্মাণ ▪ খাল খনন ও পুনঃ খনন ▪ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ ▪ পুকুর খনন ও পুনর্খনন ▪ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ▪ আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ পরিচালনা

৩.২.৩. ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি অবকাঠামো

এলজিইডি সদর দপ্তর, বিভাগ, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে এবং এলজিইডির প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভার ক্রয়কারীসহ মোট ১,১৬৪টি কার্যালয় ই-জিপি'র আওতায় আনা হয়েছে। ক্রয় প্রক্রিয়া বাবাস্তবায়ন পর্যায়ে সফটওয়্যার সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যা দ্রুত নিরসনে এলজিইডি সদর দপ্তরে ই-জিপি হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। এলজিইডি সদর দপ্তরে দুইটি কেন্দ্রীয়, ২০টি আঞ্চলিক এবং জামালপুর ও মৌলভীবাজার জেলায় দুইটিসহ মোট ২৪টি ই-জিপি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।[৭৯]

৩.২.৪.ক্রয়ের ধরন

এ প্রতিষ্ঠানে কার্য, পণ্য ও সেবা ক্রয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২০২০ সালের ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৩৬টি কাজ,[৮০] ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে ১৬ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত চারটি পণ্য,[৮১] এবং ৫ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ২১

[৭৭] স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, http://www.lged.gov.bd/site/page/81b45e52-910a-4dd6-aa2e-71cc978e9778/ (১১ আগস্ট ২০২০)।

[৭৮] স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, http://www.lged.gov.bd/site/page/3e418392-17e4-42cc-8063-9f5ba96b5115/- (২৯ ডিসেম্বর ২০১৯)।

[৭৯] স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, http://www.lged.gov.bd/sites/default/files/files/lged.portal.gov.bd/lged_publications/5120c326_4a7c_4ba5_8f73_07ce17b3d97d/2020-01-06-15-52-3908d26e2218fba5076f249df7d607c6.pdf (২৯ ডিসেম্বর ২০১৯)।

[৮০] স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, http://www.lged.gov.bd/site/view/tenders_type/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF (২৯ ডিসেম্বর ২০১৯)।

[৮১] স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, http://www.lged.gov.bd/site/view/tenders_type/%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF (২৯ ডিসেম্বর ২০১৯)।

জানুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত তিনটি সেবা[৮২] ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, যেগুলো ই-জিপি ছাড়া সাধারণভাবে ক্রয় করা হয়। সাধারণত কোনো স্কিমের/ প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ১.৫০ কোটি টাকার মধ্যে থাকলে ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নকালে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণে সীমিত দরপত্র অনুসরণ করতে হয়।[৮৩] তবে কোনো স্কীমের/ প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ১.৫০ কোটি টাকার অধিক হলে ক্রয় প্রণয়নকালে একধাপ দুইখাম দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত সীমিত দরপত্র পদ্ধতি অথবা অন্য কোনো পদ্ধতি অধিক যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হলে যৌক্তিকতা ব্যাখ্যাসহ প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।[৮৪]

৩.২.৫. ক্রয়ের বাজেট (বরাদ্দ, ব্যয়)

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে প্রতিবছর বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বরাদ্দ থাকে। গত কয়েকটি অর্থবছরের তথ্য অনুযায়ী এলজিইডি'র প্রকল্পের সংখ্যার তারতম্য থাকলেও প্রতি অর্থবছরেই এডিপি'তে বরাদ্দ এবং ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ১০)।

সারণি ১০: এলজিইডি'র বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা, বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় (২০১৬-১৭ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে)

অর্থবছর	প্রকল্পের সংখ্যা	এডিপি'তে বরাদ্দ (কোটি টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকা)
২০১৯-২০২০	১২৮	১৪,৯৫৭.৫৫	১৩,১৪৬.৬৯
২০১৮-২০১৯	১৫২	১৩,০৭৫.৫৭	১২,৯৯৫.১৬
২০১৭-২০১৮	১৪৮	১১,৮৭৯.৫৭	১১,৮৩২.২০
২০১৬-২০১৭	১৩৭	১০,৮১৯.৫০	১০৬৬৬.৯২

উৎস: এলজিইডির *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৮-১৯, পৃ. ১৯; এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, জুন ২০২০।[৮৫]

৩.২.৬. ক্রয় প্রক্রিয়া

এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, সদর দপ্তরের বিভিন্ন ইউনিট/ উইং ক্রয়কারী দপ্তর হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেকটি দপ্তরের জন্য দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি, আর্থিক সীমা সুনির্দিষ্টভাবে এলজিইডি থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।[৮৬]

এলজিইডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দরপত্র আহবানের পরিমাণ গড়ে ৯৫ শতাংশের ওপরে, তবে কোনো কোনো কাজ এখনো নন-ই-জিপি'তে হয়ে থাকে (সারণি ১১)। এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় ২ লক্ষ ৯৯ হাজারের বেশি ই-জিপিতে আহ্বানকৃত দরপত্রের মধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশই এলজিইডি'র।[৮৭]

সারণি ১১: এলজিইডি'তে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দরপত্র আহ্বানের হার (শতাংশ)

অর্থবছর	ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দরপত্র আহ্বানের হার (শতাংশ)
২০১৮-১৯	৯৮
২০১৭-১৮	৯৭
২০১৬-১৭	৯৭
২০১৫-১৬	৯৫

উৎস: এলজিইডির *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৮-১৯, পৃ. ৬৪;

৩.৩. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

৩.৩.১.প্রতিষ্ঠা

---

[৮২] স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, http://www.lged.gov.bd/site/view/tenders_type/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE (২৯ ডিসেম্বর ২০১৯)।

[৮৩] পিপিআর, বিধি ৬৩(১)(ঘ)।

[৮৪] স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিপত্র স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.৩২২.০৬.০০২.০৮২৩৮, তারিখ ২৮ জুলাই ২০১৯।

[৮৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন এলজিইডি, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৮-১৯, পৃ. ১৯, http://www.lged.gov.bd/sites/default/files/files/lged.portal.gov.bd/lged_publications/5120c326_4a7c_4ba5_8f73_07ce17b3d97d/2020-01-06-15-52-3908d26e2218fba5076f249df7d607c6.pdf, এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, জুন ২০২০, http://www.lged.gov.bd/sites/default/files/files/lged.portal.gov.bd/lged_publications/6d8e0d24_bf32_4971_a418_56ac6fd4f9f9/2020-08-05-14-43-e3e73d5fbdabee8b7e4ef09d086c966c.pdf (১১ আগস্ট ২০২০)।

[৮৬] স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, অফিস আদেশ, স্মারক নং ৪৬.০২.০০০০.৩২২.০৬.০০২.০৮-২৫০, তাং ১৪ আগস্ট ২০১৯; http://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/9/696/Committee_TEC%20and%20TOC_offline%20Tender.pdf (১২ আগস্ট ২০২০)।

[৮৭] স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, http://www.lged.gov.bd/sites/default/files/files/lged.portal.gov.bd/lged_publications/5120c326_4a7c_4ba5_8f73_07ce17b3d97d/2020-01-06-15-52-3908d26e2218fba5076f249df7d607c6.pdf (১১ আগস্ট ২০২০)।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্তির পর কেন্দ্রীয় পাকিস্তানের সকল নির্মাণকাজ সম্পাদনের দায়িত্ব গণপূর্ত বিভাগের ওপর ন্যাস্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে গণপূর্ত এবং সড়ক ও জনপথ দুই অধিদপ্তরে বিভক্ত করা হয়। বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা সড়কসহ গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও কালভার্ট উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৮৮]

৩.৩.২. কার্যক্রম

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে সওজের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সওজ যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে সেগুলো হচ্ছে:

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন মহাসড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ ও উন্নয়ন, মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ফেরী স্থাপনের জন্য মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী/ জাতীয় সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা, বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্তৃক অনুরোধ/আবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন সাময়িক অব্যবহৃত ভূমি অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারার অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মলিকানাধীন ভূমি ও স্থাপনায় অস্থায়ী ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন, বিলবোর্ড, ভাস্কর্য, স্মৃতি, স্মারক ইত্যাদি স্থাপনের অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক বিভাগের অনুকূলে ভূমি অধিগ্রহণের (উন্নয়ন প্রকল্প ব্যতীত) প্রশাসনিক অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনুমোদিত পিএমপি-সড়ক ও পিএমপি-ব্রীজ/ কালভার্ট কর্মসূচি এবং ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন।

৩.৩.৩. ক্রয়ের বাজেট (বরাদ্দ, ব্যয়)

সওজ-এর গত পাঁচ অর্থবছরের বরাদ্দ পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রতিবছরই সওজ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সওজ-এর ১৭৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল, যার অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ১৬,৬১৮.৮৫ কোটি টাকা (যার মধ্যে সরকারের ১৩,১৪১.৫৮ কোটি টাকা ও বৈদেশিক সহায়তা ৩,৪৭৭.২৭ কোটি টাকা)।[৮৯]

সারণি ১২: সওজ-এর প্রকল্প ও বরাদ্দের পরিমাণ (২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০১৮-২০১৯	১৭৯	১৬,৬১৮.৮৫
২০১৭-২০১৮	১৪০	১৪,১৪৪.৬৮
২০১৬-২০১৭	১৩৪	৮,১৯৯.২৮
২০১৫-২০১৬	১৩২	৫,৯৯০.৩২
২০১৪-২০১৫	১২৬	৩,৯৮৮.৫১

উৎস: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯*।

৩.৩.৪. ক্রয় প্রক্রিয়া

সওজ-এর তথ্য অনুযায়ী শুধু বৈদেশিক অর্থায়নের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ই-জিপি অনুসরণ করা হয় না, যেহেতু বৈদেশিক সংস্থার আলাদা কৌশলপত্র রয়েছে। এছাড়া সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে ই-জিপি অনুসরণ করা হয়। ২০১২ সালের জুলাই থেকে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৪,০৫৪টি দরপত্র ই-জিপি'তে আহ্বান করা হয়েছে (সারণি ১৩ দ্রষ্টব্য)।[৯০]

সারণি ১৩: অর্থবছর অনুযায়ী ই-জিপি'তে আহ্বানকৃত দরপত্রের সংখ্যা

অর্থবছর	ই-জিপি তে আহ্বানকৃত দরপত্রের সংখ্যা
২০১২-২০১৩	১৭২
২০১৩-২০১৪	৪,৭১৮
২০১৪-২০১৫	৩,০৪৪
২০১৫-২০১৬	৩,৪২৯
২০১৬-২০১৮	৬,৬৭১

উৎস: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, জুন ২০১৭।

৩.৪. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

৩.৪.১. প্রতিষ্ঠা

[৮৮] সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, http://www.rhd.gov.bd/OverviewOfRHD/Default.asp (১২ আগস্ট ২০২০)।

[৮৯] সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯*, পৃ. ৩৩; https://rhd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/rhd.portal.gov.bd/reports/782ef6b5_8a86_4643_b1ca_9ce8284fb378/2020-08-06-11-26-6f67a7ddd96f46e4124736c364ea882f.pdf (১৪ আগস্ট ২০২০)।

[৯০] সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, http://www.rhd.gov.bd/RHDNews/Docs/egp_report_June_2017-18.pdf (১৪ জানুয়ারি ২০২০)।

স্বাধীনতার পূর্বে এ দেশের গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নের জন্য তৎকালীন সরকারের পক্ষে বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের সুযোগ কম ছিল। ১৯৭২ সালে পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের জন্য একটি পৃথক সংস্থা গঠন করা হয়, যা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পল্লী বিদ্যুতায়ন অধিদপ্তর নামে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে পল্লী অঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতে এবং অন্যান্য গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ পৌঁছানো যাবে কি না তা যাচাইয়ের জন্য একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চালানো হয়। এরই ফলাফল হিসেবে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড গঠন করা হয় ১৯৭৮ সালে।

৩.৪.২.কার্যক্রম

বাংলাদেশের সকল জনগনকে গুনগত মানের বিদ্যুৎ সরবরাহ করার মাধ্যমে সকল জনগনকে বৈদ্যুতিক সেবার মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে এ সংস্থার প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ বিদ্যুতায়ন উন্নয়ন বোর্ড যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে সেগুলো হচ্ছে - বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান, বিদ্যুৎ বিল আদায়, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ নিষ্পত্তি, এবং বিল পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র। বর্তমানে সারা দেশে ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে ৬১টি জেলায় ২,৫১,৬৮,৭৬৩টি খানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।[৯১] ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরইবি মোট ১৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

৩.৪.৩. ক্রয়ের বাজেট (বরাদ্দ, ব্যয়)

আরইবি সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-১৯ বছরের বাজেট বরাদ্দ ১৮,১৫৬ কোটি টাকা এবং ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৮,১৫৬ কোটি টাকা।[৯২]

৩.৪.৪.ক্রয়ের ধরন

এ প্রতিষ্ঠানে কার্য, পণ্য ও সেবা ক্রয় করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ক্ষমতার্পণ আদেশ অনুসারে আরইবি'র আর্থিক ক্ষমতা ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত। ৩০ কোটি টাকার বেশি ক্রয়কাজের ক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের অনুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু উক্ত পর্যায়ের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ই-জিপি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় ৩০ কোটি টাকার বেশি ক্রয়কাজ ঐ সময়ে ই-জিপিতে করা যায় নি। এছাড়া দাতা সংস্থার অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পসমূহের ক্রয়কার্য তাদের গাইডলাইন অনুসারে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া ই-জিপি সিস্টেমে অর্ন্তভুক্ত না থাকায় সেগুলো ই-জিপি'তে করা হয় না। একই কারণে সেবা চুক্তি ও টার্ন কী চুক্তিগুলোও ই-জিপি'তে করা হয় নি।[৯৩]

৩.৪.৫.ক্রয় প্রক্রিয়া

উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে আরইবি ক্রয়কার্য সম্পন্ন করে থাকে। এ সকল পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করার জন্য ই-জিপি এবং ম্যানুয়াল উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরইবি ক্রয়খাতে মোট ব্যয়ের ১২.০২% ই-জিপি ও ৮৭.৯৮% নন ই-জিপি'র মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করে।[৯৪]

এ অধ্যায়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, ক্রয় প্রক্রিয়া, ক্রয়ের ধরন, ক্রয়ের বাজেট সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, সরকারের চারটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণভাবে ই-জিপি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে না।

---

[৯১] পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ওয়েবসাইট, http://www.reb.gov.bd/site/page/c08b56bd-c300-4d08-8ea2-c25eedffbfdb/- (১৪ আগস্ট ২০২০)।

[৯২] বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, http://www.reb.gov.bd/site/page/0617994f-0a76-4872-b274-290d36e77cb3/- (২৯ জানুয়ারি ২০২০)

[৯৩] *প্রাগুক্ত*।

[৯৪] *প্রাগুক্ত*।

ই-জিপি গাইডলাইনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়া অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে ই-জিপি পরিচালনা করতে গিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নিবন্ধন, দরপত্র তৈরি, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনাসহ একটি বড় প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। এই প্রক্রিয়াটি পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসহ প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ এবং তাদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। এই অধ্যায়ে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ই-জিপি পরিচালনায় সক্ষমতা, দক্ষতা ও কার্যকরতা বিশ্লেষণের পাশাপাশি দুর্নীতি ও কাজের মানের ক্ষেত্রে ই-জিপি'র ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪.১. গবেষণার ফলাফল

গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, ই-জিপি প্রক্রিয়া, ই-জিপি ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, এবং কার্যকরতা - এই পাঁচটি ক্ষেত্রে মোট ২০টি নির্দেশকের আলোকে ই-জিপি'র প্রয়োগ ও কার্যকরতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চারটি প্রতিষ্ঠানকে এই ২০টি নির্দেশকে নিম্ন, মধ্যম বা উচ্চ স্কোর দেওয়া হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্কোর পেয়েছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) (৫০%)। এর পরে রয়েছে পল্লী বিদ্যুৎ (আরইবি) (৪৪%), পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) (৪৩%), এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) (৪২%) (চিত্র ৫ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৫: সার্বিক স্কোর

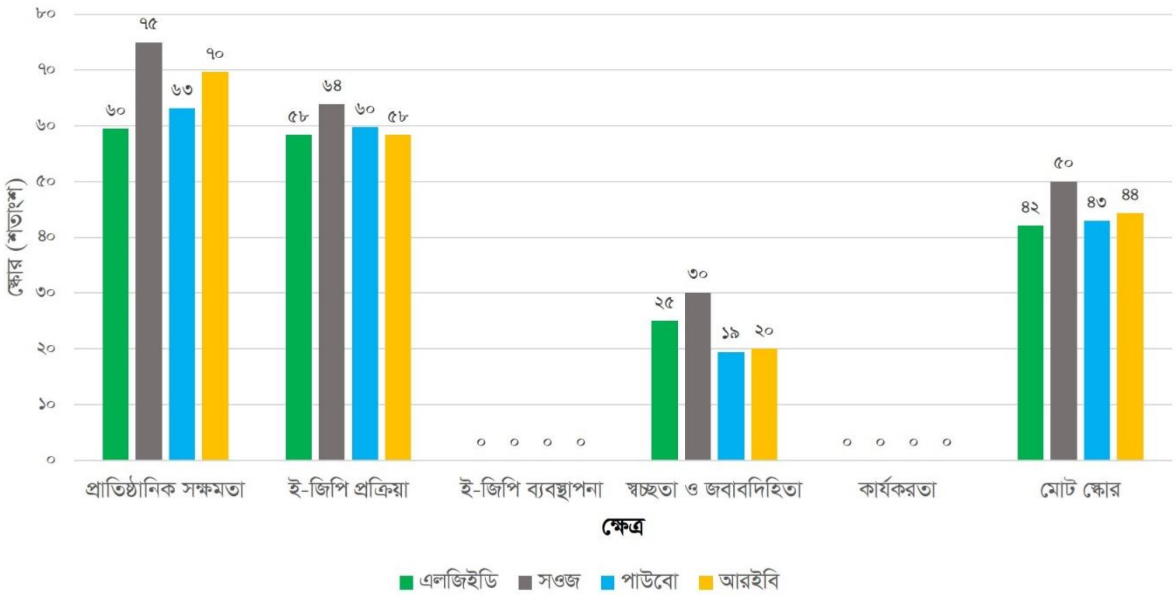

প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাপ্ত স্কোর থেকে দেখা যায় সবগুলো প্রতিষ্ঠানই প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো ও প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে (৬০%-৭৫%), তবে সওজ ও আরইবি'র সক্ষমতা অন্য দুটো প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলকভাবে ভালো। ই-জিপি প্রক্রিয়া মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রায় সব প্রতিষ্ঠান কাছাকাছি অবস্থানে (৫৮-৬৪%) রয়েছে।

অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনো অনেক উন্নতির সুযোগ রয়েছে। ই-জিপি ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকরতায় কোনো প্রতিষ্ঠানই কোনো স্কোর পায় নি বলে দেখা যায়। আবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সব প্রতিষ্ঠানের স্কোর অনেক কম (১৯-৩০%)।

গবেষণার স্কোর থেকে আরও দেখা যায় সবচেয়ে বেশি নয়টি নির্দেশকে উচ্চ স্কোর পেয়েছে সওজ; এরপরেই রয়েছে আরইবি (ছয়টি নির্দেশকে উচ্চ স্কোর)। মধ্যম স্কোর সবচেয়ে বেশি নির্দেশকে পেয়েছে এলজিইডি ও পাউবো (সাতটি নির্দেশকে)। অন্যদিকে সবগুলো প্রতিষ্ঠানই সবচেয়ে বেশি নিম্ন স্কোর পেয়েছে আটটি নির্দেশকে (বিস্তারিত চিত্র ৬)। একনজরে সবগুলো প্রতিষ্ঠানের সব নির্দেশকে অবস্থান দেখানো হয়েছে সারণি ১৪ তে।

চিত্র ৬: প্রতিষ্ঠান ও ধরনভেদে স্কোর

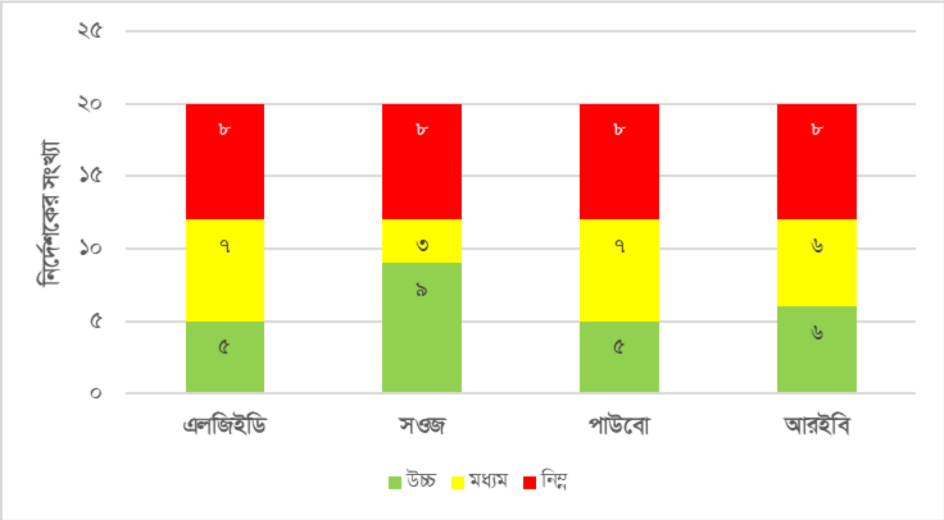

সারণি ১৪: একনজরে সব নির্দেশকে প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান

ক্ষেত্র	এলজিইডি	সওজ	পাউবো	আরইবি
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	আর্থিক সক্ষমতা	আর্থিক সক্ষমতা	আর্থিক সক্ষমতা	আর্থিক সক্ষমতা
	ভৌত সক্ষমতা	ভৌত সক্ষমতা	ভৌত সক্ষমতা	ভৌত সক্ষমতা
	কারিগরি সক্ষমতা	কারিগরি সক্ষমতা	কারিগরি সক্ষমতা	কারিগরি সক্ষমতা
	মানবসম্পদ	মানবসম্পদ	মানবসম্পদ	মানবসম্পদ
	ই-জিপি'র ব্যবহার	ই-জিপি'র ব্যবহার	ই-জিপি'র ব্যবহার	ই-জিপি'র ব্যবহার
	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
	ক্রয় সীমা	ক্রয় সীমা	ক্রয় সীমা	ক্রয় সীমা
ই-জিপি প্রক্রিয়া	ই-জিপি'তে নিবন্ধন	ই-জিপি'তে নিবন্ধন	ই-জিপি'তে নিবন্ধন	ই-জিপি'তে নিবন্ধন
	টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া	টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া	টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া	টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া
	প্রাক টেন্ডার মিটিং	প্রাক টেন্ডার মিটিং	প্রাক টেন্ডার মিটিং	প্রাক টেন্ডার মিটিং
	ই-বিজ্ঞাপন	ই-বিজ্ঞাপন	ই-বিজ্ঞাপন	ই-বিজ্ঞাপন
	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া
	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ই-জিপি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা	ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা
	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি	কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	অভিযোগ নিষ্পত্তি	অভিযোগ নিষ্পত্তি	অভিযোগ নিষ্পত্তি	অভিযোগ নিষ্পত্তি
	নিরীক্ষা	নিরীক্ষা	নিরীক্ষা	নিরীক্ষা
	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ	কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ
কার্যকরতা	অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতি
	কাজের মান	কাজের মান	কাজের মান	কাজের মান

গ্রেডিং অনুযায়ী সব প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সার্বিকভাবে ঘাটতিপূর্ণ। তবে ই-জিপি ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং কার্যকরতায় অবস্থান উদ্বেগজনক। যেসব নির্দেশকে অবস্থান উদ্বেগজনক সেগুলো হচ্ছে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, প্রাক-দরপত্র সভা, ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা, কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি, নিরীক্ষা, কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ, অনিয়ম ও দুর্নীতি, এবং কাজের মান।

সারণি ১৫: একনজরে গ্রেডিং

ক্ষেত্র	এলজিইডি	সওজ	পাউবো	আরইবি
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	ঘাটতিপূর্ণ	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	সন্তোষজনক
ই-জিপি প্রক্রিয়া	ঘাটতিপূর্ণ	সন্তোষজনক	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ
ই-জিপি ব্যবস্থাপনা	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক
কার্যকরতা	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক	উদ্বেগজনক
সার্বিক স্কোর	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ	ঘাটতিপূর্ণ

৪.২. ক্ষেত্র ১: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি স্কোর পেয়েছে সওজ (৭৫%); এর পরেই রয়েছে পাউবো (৬৩%) (চিত্র ৭ দ্রষ্টব্য)। নিচে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার বিভিন্ন নির্দেশকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের স্কোরের বিবরণ দেওয়া হলো।

চিত্র ৭: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

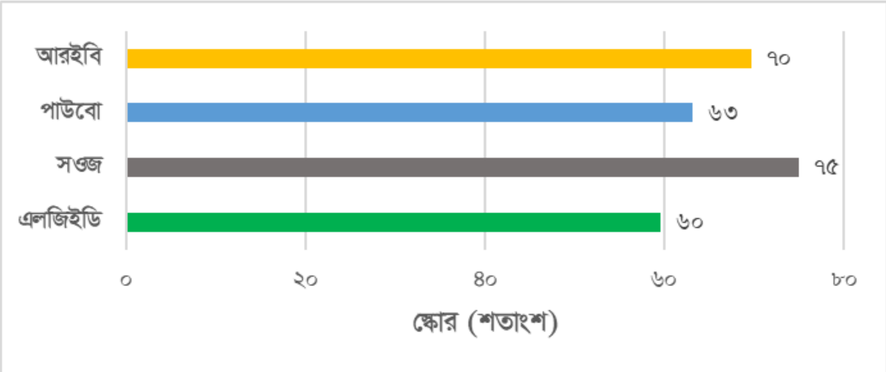

নির্দেশক ১: ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা

অন্যান্য প্রক্রিয়ার ন্যায় ই-জিপি পরিচালনার জন্যও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতার প্রয়োজন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানেই ই-জিপি পরিচালনার জন্য আর্থিক সক্ষমতা বিদ্যমান। সাধারণত ই-জিপি পরিচালনার জন্য আলাদা করে আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয় না। ই-জিপি পরিচালনার ক্ষেত্রে দরপত্র খোলা ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের জন্য পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী গেজেটের ভাতা বা সম্মানীর ব্যবস্থা করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতে আলাদা করে আর্থিক বরাদ্দের প্রয়োজনও নেই। এ প্রসঙ্গে একজন উপজেলা প্রকৌশলী বলেন, "অফিসিয়াল কার্যক্রমের সাথেই ই-জিপি খরচ মিটানো হয়। আর এটা মূলত স্ব স্ব কার্যালয় বহন করে"।[৯৫]

সাধারণত সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ই-জিপি পরিচালনা করা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নিয়মতান্ত্রিক ও গতানুগতিক কাজ। একজন মুখ্য তথ্যদাতার ভাষায়, "আমাদের এখানে পদ নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। আমার যেহেতু পদের বিপরীতে এ দায়িত্ব, এ জন্য আলাদা কোনো বরাদ্দ বা টাকা-পয়সা লাগে না।"[৯৬] ই-জিপি শুরু হওয়ার আগে শিডিউল ছাপা, ফটোকপি, টেন্ডার বই ছাপানো ও বাঁধাইসহ বিভিন্ন কাজে খরচের প্রয়োজন হতো। সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ই তাদের অন্যান্য কাজের মতো ব্যয় করত। ই-জিপি প্রবর্তনের পর এই শিডিউল ও টেন্ডার বই ছাপানো বাবদ খরচ কমেছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে অনলাইনে দাখিল করা কাগজপত্র বিশেষকরে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে কাগজপত্র প্রিন্ট করার প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতে বিশেষকরে প্রিন্ট সম্পর্কিত কাজের জন্য আলাদা আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।[৯৭]

নির্দেশক ২: ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ভৌত সক্ষমতা

ই-জিপি পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় কার্যালয়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিকসহ সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সংযোগের প্রয়োজন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবগুলো প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োজনীয় লজিস্টিকসহ বিদ্যুৎ সংযোগ বিদ্যমান। তবে ক্ষেত্রবিশেষে

[৯৫] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৭ অক্টোবর ২০১৯।
[৯৬] এলজিইডি'র একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।
[৯৭] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৭ অক্টোবর ২০১৯; পাউবো'র একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৫ আগস্ট ২০১৯; সওজ-এর একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

কোনো কোনো এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে ই-জিপি পরিচালনায় সমস্যা হয়ে থাকে, বিশেষকরে এলজিইডি'র উপজেলা পর্যায়ে এ ধরনের সমস্যা দেখা যায়। তবে কোনো কোনো কার্যালয়ে জেনারেটরের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া ই-জিপি কার্যক্রম সহজ করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি কার্যালয়েই ল্যাপটপ ব্যবহার করা হয়, ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি হলেও ই-জিপি পরিচালনায় তেমন জটিলতায় পড়তে হয় না।

নির্দেশক ৩: ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সক্ষমতা

ই-জিপি পরিচালনার জন্য কম্পিউটার, ল্যাপটপ, দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি কারিগরি সক্ষমতার প্রয়োজন, যা গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবগুলো প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে। ই-জিপি কার্যক্রমের শুরুর দিকে প্রায় প্রতিটি কার্যালয়েই ল্যাপটপ, ফটোকপি মেশিন, স্ক্যানার, রাউটার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনের তুলনায় কম কম্পিউটার[৯৮], সার্ভার স্লো থাকা, ইন্টারনেটের কম গতি[৯৯], ব্রডব্যান্ড সংযোগ না থাকা ইত্যাদি কারিগরি সক্ষমতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। পাউবো, আরইবি ও এলজিইডি'র ক্ষেত্রে উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে এই ধরনের সমস্যা তুলনামূলক বেশি। তবে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এলজিইডি এবং সওজ-এর কার্যালয়ে তুলনামূলকভাবে সক্ষমতা বেশি। এ প্রসঙ্গে একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী বলেন, "ইন্টারনেটের সমস্যা হয় অনেক সময় সার্ভার স্লো হয়। যেদিন সাবমিট করার শেষ দিন সেদিন বেশি ঝামেলা হয়।"[১০০] ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াইফাই সংযোগ কিংবা কার্যালয় কর্তৃক ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হলেও তা কার্যকর থাকে না বলে দেখা গেছে। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় আলাদা মডেমের মাধ্যমে কিংবা প্রাইভেট লাইনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করে ই-জিপি পরিচালনা করে থাকে। যেমন, একটি উপজেলা এলজিইডি কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে ইন্টারনেটের যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে তা কার্যকর নয় বলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাইরে থেকে ওয়াইফাই-এর সংযোগ নেওয়া হয়েছে বলে দেখা যায়। তবে কোনো ধরনের কারিগরি সমস্যা হলে সিপিটিইউ-এর হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে তার সমাধান করা যায়।

নির্দেশক ৪: ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় কার্যালয়ে নিয়ম-মাফিক কাজ পরিচালনার পাশাপাশি ই-জিপি প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত জনবলের প্রয়োজন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে, বিশেষকরে এলজিইডি'র উপজেলা কার্যালয়গুলোতে অনুমোদিত পদের বিপরীতে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। একটি উপজেলা এলজিইডি কার্যালয়ে মোট ২১টি পদ থাকলেও কাজ করছে ১২ জন অর্থাৎ সেখানে ৯ টি পদ শুণ্য রয়েছে।[১০১] কিছু ক্ষেত্রে উপজেলা প্রকৌশলী ও সহকারী উপজেলা প্রকৌশলীর পদে ঘাটতি লক্ষণীয়। একটি প্রতিষ্ঠানে তিনজন উপজেলা প্রকৌশলীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রত্যেকেই দুটি করে উপজেলার দায়িত্ব পালন করছেন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কোনো কার্যালয়েই ই-জিপি পরিচালনার জন্য আলাদা কোনো সেল বা বিভাগ নেই। তবে এলজিইডি'র ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ই-জিপি সেল রয়েছে। একইভাবে পাউবো'তে অনুমোদিত পদের বিপরীতে জনবলের ঘাটতি বিদ্যমান।

সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলী) তাদের নিয়মিত দাপ্তরিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে ই-জিপি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। দরপত্রের নথি তৈরি, বিজ্ঞাপন প্রদান, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন থেকে শুরু করে ঠিকাদার নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান, কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ ক্রয় সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সম্পাদন করেন। উল্লেখ্য, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে ই-জিপি ফোকাস একজন সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এলজিইডি কার্যালয়ের ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রতিবছর প্রায় ৫০০ থেকে ১,০০০টি কাজের দরপত্র আহবান করা হয়। ফলে এই কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জনবলের প্রয়োজন।

ই-জিপি'র জন্য বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না থাকা এবং সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবলের ঘাটতি থাকার কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর অতিরিক্ত কাজে চাপ পড়ে। জনবলের ঘাটতি ও কাজের চাপ সম্পর্কে একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী বলেন, "ই-জিপি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী-কর্মকর্তা - আমি বলবো নাই। একজন নিবার্হী প্রকৌশলীকে অনেক কাজ করতে হয়। বছরে তাকে মিটিং করতে হয় ৫০০-এর উপরে। এরপরও কি একজন প্রকিউরিং এনটিটির পক্ষে সম্ভব এত কিছু ম্যানেজ করা?"[১০২] এছাড়া একটি দরপত্রের বিপরীতে প্রচুর আবেদন পড়ায় সেগুলো যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এলজিইডি'তে ১৫ লাখ টাকার একটা কাজে প্রায় ৩০০টির মত আবেদন পড়ে। ফলে যে জনবল আছে তা দিয়ে এতগুলো আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচাই বাছাই করা কঠিন।[১০৩]

প্রায় সব প্রতিষ্ঠান বিশেষকরে এলজিইডি কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের মতে সরকারি ক্রয়ের জন্য প্রতিটি কার্যালয়েই আলাদা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকা প্রয়োজন। দরপত্র সংক্রান্ত কাজের চাপের কারণে ক্ষেত্রবিশেষে কর্মকর্তাদের নির্ধারিত সময়ের বাইরে

---

[৯৮] পাউবো'র উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৫ আগস্ট ২০১৯।

[৯৯] এলজিইডি'র তিনটি উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়।

[১০০] পাউবো'র একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৫ আগস্ট ২০১৯; এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৪ আগস্ট ২০১৯।

[১০১] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী যিনি আরেকটি উপজেলার ভারপ্রাপ্ত উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৭ অক্টোবর ২০১৯।

[১০২] এলজিইডি'র একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।

[১০৩] এলজিইডি'র একজন সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।

অতিরিক্ত সময়ে এমনকি বন্ধের দিনেও কাজ করতে হয়। কোনো কোনো কর্মকর্তাকে সকাল সাতটা ৩০ মিনিটে কার্যালয়ে আসতে হয়।[১০৪] সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলোর প্রকৌশলীরা নিয়মিত কাজের পাশাপাশি দরপত্র সংক্রান্ত কাজ করে থাকেন। কর্মকর্তাদের ই-জিপি'র দরপত্র তৈরি, প্রকাশ, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন ও চুক্তি সম্পাদন করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে হয়।

ই-জিপি একটি বিশেষায়িত ব্যবস্থা হওয়ায় এটি পরিচালনা ও এর মাধ্যমে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। ই-জিপি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে সিপিটিইউ'র উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সরকারি কার্যালয়, ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার, ব্যাংক প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন অংশীজনদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ই-জিপি বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহযোগী হিসেবে এলজিইডি'র মাধ্যমেও ই-জিপি বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সিপিটিইউ'র তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ সাল থেকে ২০১৯ এর জুলাই পর্যন্ত ই-জিপি'র ওপর সরকারি কর্মকর্তা, ঠিকাদার ও ব্যাংক প্রতিনিধিদের ১৫,৯৫৭টি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২০১৭ থেকে চালু হওয়া ডাইম্যাপ প্রজেক্টের আওতায় প্রায় ৮,০০০ জনকে (সাংবাদিক, ঠিকাদার, সরকারি কর্মকর্তা) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ডাইম্যাপের মেয়াদ হলো ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত। প্রায় ১৬ থেকে ১৮ ক্যাটেগরির ওপর এ প্রশিক্ষণগুলো দেয়া হয়। সাধারণত বিসিএস কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের সময় ২ দিন আর যারা ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।[১০৫]

তবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি বিশেষকরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কম্পিউটারের মাধ্যমে ই-জিপি পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা ই-জিপি পরিচালনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও নিজেরা করতে আগ্রহী হন না।[১০৬] সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটররাই তাদের হয়ে ই-জিপি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ প্রসঙ্গে আরইবি'র একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন, "পাসওয়ার্ড আমাদের নামে হলেও আমার কম্পিউটার অপারেটরই সব কাজ করে। আমাদেরতো এতো সময় দেওয়া সম্ভব না"।[১০৭]

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টরা আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ না পেয়ে কম্পিউটার সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান ও কার্যালয়ের অন্য যারা জানে তাদের কাছ থেকে শিখে ই-জিপি'র কাজ পরিচালনা করে। তুলনামূলকভাবে এলজিইডি'র সাথে সংশ্লিষ্টরা অন্যদের চেয়ে বেশি প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে উপজেলা এলজিইডি ও আরইবি কার্যালয়ে ই-জিপি ও পিপিআর সম্পর্কে দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একজন কম্পিউটার অপারেটর বলেন, "ই-জিপি'র জন্য আলাদা কোনো ট্রেনিং পাই নাই। কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে যতটুকু বুঝি। কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে সরাসরি সিপিটিইউ'তে ই-জিপির দায়িত্বে থাকা স্যারকে ফোন দেই"।[১০৮] সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে একজন ঠিকাদার জানান, অনেক কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ নেই।[১০৯] এছাড়া আরইবি'র একজন নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন, "ই-জিপি সম্পর্কে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে শিখেছি। আবার অনেকটা দেখতে দেখতে শিখেছি। কিন্তু ই-জিপি সম্পর্কে সিপিটিইউ থেকে কোনো ট্রেনিং পাইনি"।[১১০] সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে ই-জিপির ব্যবহার ও পিপিআর সম্পর্কিত আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।[১১১]

নির্দেশক ৫: ই-জিপি'র ব্যবহার

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সকল সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি অনুসরণের বিধান থাকলেও গবেষণায় দেখা গেছে এখনো সবগুলো প্রতিষ্ঠানে শতভাগ ক্রয়ে ই-জিপি ব্যবহার করা হয় না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় এসব প্রতিষ্ঠানের ২% থেকে শুরু করে ৮৮% পর্যন্ত ক্রয় ই-জিপি'তে হয় না। উল্লেখ্য, প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী পাউবো ৪৬.০৭%, এলজিইডি ২% ও আরইবি প্রায় ৮৮% ক্ষেত্রে নন ই-জিপি বা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ক্রয় করে (সওজ-এর তথ্য পাওয়া যায় নি)।[১১২] জরুরি ভিত্তিতে ক্রয়, কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি অনুসরণ করা হয় না। এ প্রসঙ্গে এলজিইডি'র একজন প্রকৌশলী বলেন, "ছোটখাটো কেনাকাটা সেগুলো সরাসরি করা হয়। সরাসরি কেনাকাটা করার ক্ষেত্রে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্ডার করা আছে"।[১১৩] এছাড়া আন্তর্জাতিক দরপত্র ও ক্ষেত্রবিশেষে শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত ক্রয় প্রক্রিয়ায়ও ই-জিপি অনুসরণ করা হয় না। এলজিইডি'র রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং এর মাধ্যমে বাস্তবায়নকৃত উপজেলা পরিষদের ক্রয়ে অনেক জায়গায়ই ই-জিপি পুরোপুরি চালু হয় নি।[১১৪] একজন উপজেলা প্রকৌশলী বলেন, "ইমার্জেন্সি কাজ করা লাগলে সেক্ষেত্রে কোটেশনটা আমরা এখনো অফ-লাইনে করি"।[১১৫] আরইবি'র ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় হয়ে থাকে। আরইবি'তে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ওটিএম) ব্যবহার

[১০৪] এলজিইডি'র একজন সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৩১ আগস্ট ২০১৯।
[১০৫] সিপিটিইউর সাথে দলগত আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দলগত আলোচনার তারিখ ১৫ জুলাই ২০১৯।
[১০৬] গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর একাধিক অফিসে এমন চিত্র দেখা গেছে।
[১০৭] আরইবি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১০৮] আরইবি'র একজন কম্পিউটার অপারেটর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ অক্টোবার ২০১৯।
[১০৯] একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১১০] আরইবি'র একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ অক্টোবর ২০১৯।
[১১১] এলজিইডি, পাউবো ও সওজ-এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মতামত অনুযায়ী।
[১১২] তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
[১১৩] এলজিইডি'র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৯।
[১১৪] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১১৫] *প্রাগুক্ত*।

করা হলেও এক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির শর্ত রয়েছে। তবে সমিতি পর্যায়ের ক্রয়ে ই-জিপির অনুসরণ করা হয় না।[১১৬] এছাড়া সব প্রতিষ্ঠানেই সামরিক বাহিনীর দ্বারা সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রে ই-জিপি অনুসরণ করা হয় না।[১১৭]

ই-জিপি গাইডলাইন অনুসরণ: ই-জিপি পরিচালনার জন্য পিপিআর ২০০৮-এর সাথে সমন্বয় করে ই-জিপি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে, যা অনুসরণ করতে সব নিবন্ধিত ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান বাধ্য। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাই ই-জিপির গাইডলাইনকে যথেষ্ট বিস্তারিত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এই গাইডলাইন সবময় পুরোপুরি অনুসরণ করা হয় না। এলজিইডি'র ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে কিংবা অজান্তে কোনো ভুল হলে এলজিইডি'র প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের হেল্প ডেস্কে জানানো হয়।[১১৮] ই-জিপি পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যা দেখা যায় তার মধ্যে সার্টিফিকেটের সঠিক কোনো রেফারেন্স না পাওয়া, কমিটির নাম দুইবার আসা, এলাকা বাছাইয়ের সমস্যা, ফাইল আপলোডে সমস্যা হওয়া, পুনরায় দরপত্রের ক্ষেত্রে পুরনো ডকুমেন্ট ব্যবহার করতে না পারা অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন করে করে দরপত্র দেওয়া, এবং সার্বিকভাবে ই-জিপি ব্যবহার-বান্ধব না হওয়া উল্লেখযোগ্য।

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (লিমিটেড টেন্ডার মেথড - এলটিএম), উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ওপেন টেন্ডার মেথড - ওটিএম) এবং বা একধাপ দুইখাম দরপত্র পদ্ধতি (One Stage Two Envelope Tender Method - ওএসটিইটিএম) ব্যবহার করা হয়। সাধারণত সওজ-এর ক্ষেত্রে ওটিএম এবং এলজিইডি'র ক্ষেত্রে ওএসটিইটিএম পদ্ধতির অনুরসণ করা হলেও সওজ-এর ক্ষেত্রে বর্তমানে এলটিএম পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে না।

ঠিকাদারদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ: ই-জিপি ব্যবহারের জন্য ঠিকাদারদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার প্রয়োজন। গবেষণায় দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই ঠিকাদারদের ই-জিপি'তে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে। কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ঠিকাদারদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হলেও উপজেলা পর্যায়ে ঠিকাদারদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। একটি প্রতিষ্ঠানের একজন উপজেলা প্রকৌশলী বলেন, "আমাদের এখান থেকে ঠিকাদারদের কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না।"[১১৯] এছাড়া ঠিকাদারদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনেক কর্মকর্তাই অবহিত নন।[১২০] এ প্রসঙ্গে একজন নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন, "আমরা ঠিকাদারদের কোনো ট্রেনিং দেই না। তবে একবার ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। মূলত টেন্ডার হলে কেন্দ্র থেকে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। নিবন্ধন বা টেন্ডার সাবমিট করার ক্ষেত্রে এখন সব ঠিকাদাররাই অনেক এক্সপার্ট; তাদের নিজস্ব এক্সপার্টকেই পাঠায় ট্রেনিংয়ে। সবাই মূলত ই-জিপি সম্পর্কে জানে, তাই প্রয়োজন হয় না। আবার আমাদের এলজিইডি কার্যালয়ে তো ছোট ছোট টেন্ডার হয় সে কারণে আমাদের ট্রেনিং দরকার হয় না"।[১২১] তবে ক্ষেত্রবিশেষে ই-জিপিতে নিবন্ধন ও দরপত্র দাখিল করার ক্ষেত্রে কেউ সাহায্য চাইলে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে তা দেওয়া হয়।

ঠিকাদারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও ক্ষেত্রবিশেষে তা কার্যকর নয়। একজন ঠিকাদার তার প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বলেন, "আমি ই-জিপি'র উপর ১৪ বার ট্রেনিং নিছি, তারপরও বেশি কিছু শিখতে পারি নাই।" এছাড়া প্রশিক্ষণ পেলেও অনেক জায়গায়ই ঠিকাদারেরা নিজেরা দরপত্র দাখিল করেন না কিংবা ই-জিপি ব্যবহার করেন না। অনেক এলাকায় ঠিকাদারদের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি শিক্ষা না থাকার কারণে ই-জিপি প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত নন। ফলে তাদেরকে অন্যদের সাহায্য নিতে হয়। সাধারণত বড় ঠিকাদারদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকে, বিশেষকরে তাদের কম্পিউটার অপারেটর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ই-জিপি সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদন করেন। অনেক ঠিকাদার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত বিভিন্ন কম্পিউটারের দোকান থেকে দরপত্র জমা দেন। একজন ঠিকাদারের ভাষায়, "বাহিরে আমাদের নিজস্ব লোক আছে, তাদের দিয়ে সাবমিট করি। ১০০/২০০ টাকা দিয়ে কাজ করাই। কাজ পাইলে ২,০০০ টাকা দিয়ে দেই"।[১২২]

কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় কার্যালয় কিংবা অন্য কার্যালয়ের (যেমন সওজ, এলজিইডি) কম্পিউটার অপারেটরদের মাধ্যমে ঠিকাদারেরা ই-জিপি সম্পর্কিত কাজ করিয়ে নেন। এ প্রসঙ্গে এলজিইডি'র একজন কম্পিউপটার অপারেটর বলেন, "যারা জানে না তাদের আমরা সহযোগিতা করি। প্রায় ৮০/৯০ শতাংশ লোক নিজেরা না করে আমাদের মাধ্যমে করে। তারা আমাদের কাছে সব ডকুমেন্ট দিয়ে দেয়, আমরা কাজ করে দেই। আইডি খুলে দেওয়া থেকে শুরু করে সব কিছু করে দেই। ৫ শতাংশের মত নিজেরা করে"।[১২৩] আবার কেউ কেউ আত্মীয়-স্বজনদের মাধ্যমে দরপত্র জমা দেয়।

নির্দেশক ৬: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) তৈরি করতে হয় এবং তা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হয়। তবে প্রায় সব কার্যালয়েই বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা না করে একটি বাজেট করা হয়। সেই বাজেটের আলোকে এপিপি করার পর অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়ে থাকে। একেক সময় একেক প্রকল্পের পরিকল্পনা আপলোড করা হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকল্পের (চলমান ও পুরনো) তালিকা দেওয়া থাকলেও পূর্ণাঙ্গ ক্রয় পরিকল্পনা দেওয়া নেই।

---

[১১৬] আরইবি'র একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।
[১১৭] আরইবি'র একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ নভেম্বর ২০১৯।
[১১৮] এলজিইডি'র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৯।
[১১৯] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৪ আগস্ট ২০১৯।
[১২০] এলজিইডি'র একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।
[১২১] এলজিইডি'র একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৯।
[১২২] একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৭ অক্টোবর ২০১৯।
[১২৩] এলজিইডি'র একজন কম্পিউটার অপারেট, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৪ আগস্ট ২০১৯।

তবে যখন কোনো প্রকল্পের কাজ শুরু হয় তখন সেই প্রকল্পের দরপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত সিপিটিউ'র ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়। প্রকল্প বেশিরভাগক্ষেত্রে এক বছরের অধিক মেয়াদের হয়ে থাকে। তাই চলমান প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে না পারলে ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তন করা হয়। ডিপিপি অনুযায়ী একটি প্রকল্প বা স্কিমের বাজেট অনুমোদন হয়ে আসার পর এপিপি করে ই-জিপি'তে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

তবে ই-জিপি'তে এপিপি'র গুরুত্ব কমে আসছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। এ প্রসঙ্গে একজন উপজেলা প্রকৌশলী বলেন, "প্রথমে একটা বাজেট হয়, সে অনুযায়ী একটা প্রস্তাব পাঠান এবং সেগুলো এপ্রোভ হলে সেটাকেই ই-জিপিতে বাস্তবায়ন করা হয়, আর সেগুলোই এপিপিতে উল্লেখ করা – প্রসেস এটাই। কিন্তু বাংলাদেশে ই-জিপি চালু হওয়ার পরে এপিপি তেমন গুরুত্ব বহন করে না। এপিপি মানে তো একটা বছরে কি কি কাজ হবে তার একটা লিস্ট করে পাবলিশ করা। কিন্তু ই-জিপি আসার পর দেখতেছি প্রতিটা প্রজেক্টের জন্য আলাদা স্কিমের লিস্ট করতে হয়। অর্থাৎ একটা প্রজেক্ট অনুমোদন হয় আমাকে তখন একটা এপিপি করার নির্দেশ দেওয়া হয়"।[১২৪]

এপিপি সম্পর্কে একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী বলেন, "আগে প্রত্যেকটা প্রজেক্টের জন্য আলাদা এপিপি হইতো। এটা এখন কমে গেছে। এখন বছরে একটা মাত্র এপিপি করলেই হয়ে যায়। ধরেন জিসিপি-৩ একটা প্রকল্প এর জন্য একাট এপিপি করতে হবে। এর অধীনে হাজার হাজার স্কীম থাকতে পারে। নতুন কিছু আসলে আমি শুধু আইডিটা এড করে দিলেই হবে। প্যাকেজ করা যায় একবারে আসলে একবার সাবমিট হয়ে গেলে ঐ এপিপিতে নতুন করে কোনো কিছু আর এড করা যাবে না। এখন আপনি চেষ্টা করলেও আলাদা এপিপি করতে পারবেন না। আমাদের এখানে যেটা হয় আজকে অনুমোদন দিল তখনই আমরা এপিপি করে পাঠাই। এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রসেস - সারা বছরই এটা চলতে থাকে। বছরের শুরুতেই **১২** মাসের একটা প্ল্যান করে ফেললাম ব্যাপারটা এমন না"।[১২৫]

নির্দেশক ৭: ক্রয় সীমা

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্রয়ের অর্থমূল্য অনুযায়ী ক্রয় সীমা নির্ধারণ করা হয়। কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা কত টাকার ক্রয়ের কার্যাদেশ দিতে পারবেন তা 'ডেলিগেশন অব ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার' অনুযায়ী নির্ধারণ করা আছে। তবে প্রতিষ্ঠানভেদে এর কিছুটা তারতম্য রয়েছে। কার্যালয়ভেদে উপজেলা প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক থেকে শুরু করে প্রধান প্রকৌশলী, মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত অনুমোদন প্রক্রিয়া বিদ্যমান। ক্রয়সীমা অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পরিবর্তন হয়। যেমন, এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর ক্ষেত্রে ৩০ লাখ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ৫০ লাখ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর ক্ষেত্রে **১** কোটি টাকা পর্যন্ত ক্রয় সীমা বিদ্যমান।[১২৬] তবে ক্ষেত্রবিশেষে প্রাক্কলিত ব্যয় বেড়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় যোগ করার অনুমোদন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী বলেন, "৫০ লাখ টাকার কাজ কিভাবে ৫৫ লাখ টাকা হয়? এটা বাজেট যদিও ৫০ লাখ টাকা কিন্তু এস্টিমেট কস্ট হিসেব করতে গিয়ে এটা বেড়ে যায়। ধরেন তিন মিটার একটা রাস্তার কাজের সাথে সাইটে একটা আলাদা জিনিসপত্র লাগলো। অথবা পরিবহন কস্ট বেড়ে গেলে এটা বাড়ে। অ্যাড করে দিতে হয়"।[১২৭]

এছাড়া ক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটির সীমা একরকম, ক্রয়কারী হিসেবে ক্রয় করার বা টেন্ডার দেওয়ার ক্ষমতার সীমা একরকম, আবার অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষমতা আরেক রকম।[১২৮] একজন উপজেলা প্রকৌশলী বলেন, "উপজেলার স্কুল, উন্নয়নমূলক কাজ এগুলোর পিএম হচ্ছে উপজেলার অফিসার। আবার উপজেলা এলজিইডি'র উন্নয়নমূলক কাজ সেগুলো এবং সাথে উপজেলার স্কুলও সেগুলোর ডেলিগেশন পাওয়ার উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। আমাদের অন্য মিনিস্ট্রির কাজও করতে হয়। ওগুলোতে আমি হচ্ছি প্রজেক্ট ম্যানেজার। উপজেলার কাজগুলো উপজেলার অধীনেই বাস্তবায়ন হয় কিন্তু আমি সেগুলোর পিই হিসেবে থাকি। আর অ্যাসিস্টেন্ট উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার সে হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজার।'[১২৯] পাউবো'র ক্ষেত্রে ক্রয়সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে একজন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী বলেন, "সরকারের যে ফিন্যান্সিয়াল ডেলিগেশন পাওয়ার আছে সেই অনুযায়ী হয়। বিভিন্ন প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পাউবো'র মাধ্যমেই এটা নির্ধারিত হয়। বোর্ড ফিন্যান্সিয়াল ডেলিগেশন পাওয়ারকে রিডেলিগেট করতে পারে।'[১৩০]

৪.৩. ক্ষেত্র ২: ই-জিপি প্রক্রিয়া

ই-জিপি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি স্কোর পেয়েছে সওজ (৬৪%); এর পরেই রয়েছে পাউবো (৬০%) (চিত্র ৮ দ্রষ্টব্য)। নিচে ই-জিপি'র বিভিন্ন নির্দেশকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের স্কোরের বিবরণ দেওয়া হলো।

চিত্র ৮: ই-জিপি প্রক্রিয়া

[১২৪] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১২৫] এলজিইডি'র সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।
[১২৬] *প্রাগুক্ত*।
[১২৭] *প্রাগুক্ত*।
[১২৮] এলজিইডি'র সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।
[১২৯] এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৯ অক্টোবর, ২০১৯।
[১৩০] পাউবো'র উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১০ অক্টোবর, ২০১৯।

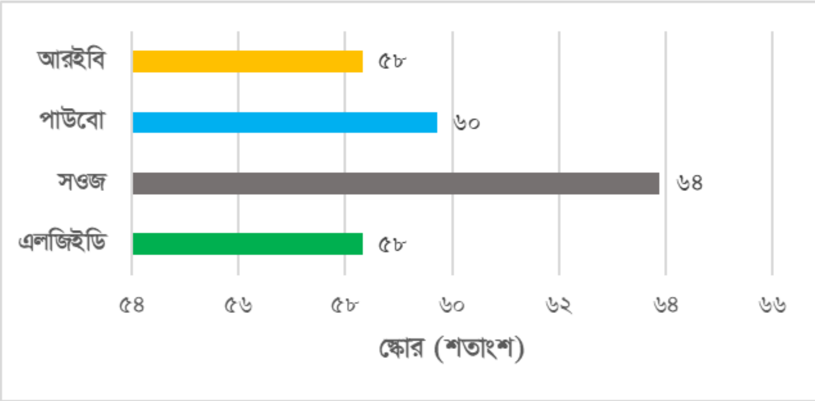

নির্দেশক ৮: ই-জিপি'তে নিবন্ধন

গাইডলাইন অনুযায়ী সব ই-জিপি ব্যবহারকারীদের (ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার, উন্নয়ন অংশীদার, অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদার, মূল্যায়ন কমিটি) ই-জিপি ব্যবস্থায় নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক।[১৩১] তবে গবেষণায় দেখা গেছে ক্রয় সংক্রান্ত প্রধান অংশীজন, যেমন: ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার ও ব্যাংকই কেবল ই-জিপি'তে নিবন্ধিত। ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ই-জিপি'তে নিবন্ধিত হলেও ঠিকাদারকে ফি দিয়ে নিবন্ধন করতে হয়।

ই-জিপি চালুর প্রথম দিকে অধিংকাশ ঠিকাদারই সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের সহায়তায় ই-জিপি'তে নিবন্ধিত হয়েছেন। ঠিকাদারদের আইডি খুলে দেওয়া ও নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে এলজিইডি। এ প্রসঙ্গে একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী বলেন, "বাংলাদেশে এখন যে পরিমাণ আইডি হইছে তার ৮০% ই মনে হয় খুলে দিয়েছে এলজিইডি"।[১৩২] ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী ঠিকাদারদের ই-জিপিতে নিবন্ধিত হতে হলে ৮ ধরনের নথিপত্র লাগে। নিবন্ধিত না হলে ঠিকাদারেরা ই-জিপিতে আবেদন করতে পারবেন না।[১৩৩]

তবে ক্ষেত্রবিশেষে টাকার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটরদের মাধ্যমে ই-জিপি আইডি খোলা ও নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। নিবন্ধন ফি ৫,৫০০ টাকা হলেও ছয় হাজার থেকে শুরু করে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় করেছেন ঠিকাদারেরা। এ প্রসঙ্গে একজন ঠিকাদার বলেন, "আমি ই-জিপি'তে নিবন্ধন করেছি রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে কার্যালয় থেকে। সেখানকার কম্পিউটার অপারেটর করে দিছে। এমনিতে আপনার রেজিস্ট্রেশন ফি হইছে ৫,৫০০ টাকা। আসা যাওয়াসহ তারতো একটা খরচ আছেই"।[১৩৪] এক্ষেত্রে কম্পিউটার অপারেটরকে ১০,০০০ টাকা দিয়ে নিবন্ধন করেছেন। এছাড়া আরেকজন ঠিকাদার জানান, "এলজিইডি'র একজন প্রকৌশলীর একটা আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম আছে। ওনাদের ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়াসহ সব কাজ করার নিজস্ব লোক আছে - তো ওরাই সবকিছু করে দেয়। নিবন্ধনে ৫,০০০ টাকা লাগছে ব্যাংকে। ৬/৭ হাজার টাকা হবে ভ্যাট ট্যাক্সসহ"।[১৩৫] আরেকজন ঠিকাদার জানান, "কার্যালয়ের হেল্প নিয়াই রেজিস্ট্রেশন করেছি। রেজিস্ট্রেশনের একটা ফি নিয়েছে। মোট ৮,০০০ টাকা দিয়েছি"।[১৩৬] একটি এলজিইডি কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটর ই-জিপি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ৮,০০০ টাকা নেন বলে জানা যায়।[১৩৭]

তবে কোনো কোনো ঠিকাদার নিজেই নিবন্ধন করে থাকেন, যদিও এই সংখ্যা খুব বেশি নয়। এ প্রসঙ্গে একজন ঠিকাদার বলেন, "আমার ই-জিপি নিবন্ধন আমি নিজেই করেছি। সব কাজ আমিই করছি। প্রতি বছর লাইসেন্স রিনিউ করতে সব মিলিয়ে ২০,০০০ টাকা খরচ হয়"।[১৩৮]

নির্দেশক ৯: টেন্ডার ওপেনিং প্রক্রিয়া

ই-জিপি'র গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিটি ক্রয়ের জন্য ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান থেকে দুই সদস্যের একটি টেন্ডার ওপেনিং কমিটি (টিওসি) গঠন করতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী দুই সদস্যের একজনকে অবশ্যই ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান থেকে হতে হবে।[১৩৯]

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানে ক্রয়ের জন্য টেন্ডার ওপেনিং কমিটি গঠন করা হয়। টিওসি'র সদস্য কে কে হবেন তা ক্রয়ের আর্থিক মূল্যের ওপর নির্ভর করে।[১৪০] এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে সাধারণত সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী এবং

---

[১৩১] ই-জিপি গাইডলাইনের ৩.২.২ অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।
[১৩২] এলজিইডি'র সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।
[১৩৩] *প্রাগুক্ত*।
[১৩৪] একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১৩৫] একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১৩৬] একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৭ অক্টোবর ২০১৯।
[১৩৭] একজন কম্পিউটার দোকানদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।
[১৩৮] একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১৩৯] ই-জিপি গাইডলাইনের ৩.৫.৬ অনুচ্ছেদে এবং পরিশিষ্ট ২ এর ৩ নম্বরে টেন্ডার ওপেনিং কমিটি সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।
[১৪০] এলজিইডি'র একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

সহকারী প্রকৌশলী এই কমিটির সদস্য, উপজেলার ক্ষেত্রে সাধারণত উপজেলা প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী টিওসি'র সদস্য হিসেবে কাজ করে। তবে দরপত্র উন্মুক্ত করায় অনেকসময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সময়মতো কিংবা সার্ভারের সমস্যার কারণে দরপত্র উন্মুক্ত করতে না পারলে হেড অব প্রকিউরিং এনটিটি'র (HOPE) মাধ্যমে ওপেন করতে হয়।'[১৪১] টিওসি'র যেকোনো একজন সদস্য লগ-ইন করলেই দরপত্র উন্মুক্ত হয়ে যায়।

তবে গবেষণায় দেখা গেছে ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটররাই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পক্ষে লগ-ইন করে টেন্ডার ওপেন করেন।[১৪২] দরপত্র খোলার আগে ঠিকাদারদের পরিচয় গোপন থাকার নিয়ম থাকলেও কোনো প্রতিষ্ঠানেই এটি গোপন থাকে না। কোনো কোনো কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটরই টাকার বিনিময়ে ঠিকাদারদের হয়ে দরপত্র দাখিল করেন।

নির্দেশক ১০: প্রাক টেন্ডার মিটিং

ই-জিপি'র নিয়ম অনুযায়ী গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান টেন্ডারে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে অনলাইনে প্রাক-টেন্ডার মিটিং করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার বা আবেদনকারী অনলাইনে তাদের প্রশ্ন উত্থাপন করবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অনলাইনে সে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবে।[১৪৩] সাধারণত এই মিটিংয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় দেওয়া থাকে, যার মধ্যে কেউ প্রশ্ন করলে তার উত্তর দেওয়া হয়।

তবে প্রতিটি ক্রয়ের জন্য প্রাক-টেন্ডার মিটিং করার নিয়ম থাকলেও কোনো প্রতিষ্ঠানই এই মিটিং করে না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের মতে এই প্রশ্ন-উত্তর প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারেরা খুব কমই অংশগ্রহণ করে। দরপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানার একটা প্ল্যাটফরম হলেও এই মিটিং আনুষ্ঠানিকভাবে হয় না। তবে কাজ নেওয়ার আগে কেউ কিছু জানতে চাইলে তাকে কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হয়।[১৪৪] এ প্রসঙ্গে একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী বলেন, "এখন যে সিস্টেম আছে সেটা আসলে এক ধরনের ডিসকাশন। আর কিছু নয়। প্রশ্ন করা আর উত্তর দেওয়া। তবে এটা প্র্যাকটিস করে না। আমি এ পর্যন্ত পাই নাই"।[১৪৫] কোনো ধরনের তথ্য জানা কিংবা কোনো সমস্যা হলে ঠিকাদারেরা সাধারণত সরাসরি কিংবা ফোনে যোগাযোগ করে থাকে, অনলাইন সিস্টেমে কেউ সেভাবে অংশগ্রহণ করে না।[১৪৬] একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী বলেন, "প্রি-টেন্ডার মিটিংয়ের জন্য আমরা ওয়েবসাইটে ঠিকাদারদের আহ্বান করি কিন্তু তারা সাড়া দেয় না। এবং তারা ঐ তারিখে কেউ আসে না বরং তারা আসে তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে, নিজেদের মত করে কোনো সমস্যা ফেস করলে তার সমাধান নেয়ার জন্য"।[১৪৭]

অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারের পরিচয় প্রকাশ: টেন্ডার খোলার আগে ঠিকাদারদের পরিচয় গোপন থাকার নিয়ম রয়েছে। এছাড়া প্রাক-টেন্ডার মিটিংয়ে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারদের নাম এবং কে প্রশ্ন করেছে তার নাম অন্য ঠিকাদারদের জানানোর নিয়ম নেই।[১৪৮] বিভিন্ন কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে ঠিকাদারদের পরিচয় জানার কোনো সুযোগ নেই।[১৪৯]

তবে ই-জিপি চালুর শুরুর দিকে কিছু কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাই ঠিকাদারদের হয়ে দরপত্র জমা দেওয়ার কারণে তাদের পরিচয় গোপন থাকতো না। এ ছাড়া কিছু কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটররাই টাকার বিনিময়ে ঠিকাদারদের হয়ে দরপত্র জমা দেয়।[১৫০] তবে এলাকা ও কার্যালয়ভেদে ঘুরেফিরে সুনির্দিষ্ট কয়েকজন ঠিকাদারই দরপত্র জমা দেয়। ফলে কার্যালয়ের কর্মকর্তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারদের চেনেন। এ প্রসঙ্গে এলজিইডি'র একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী বলেন, "আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানার সুযোগ আছে। যদি ঠিকাদাররা বলে তাহলে জানার সুযোগ আছে। যদি বলে যে আমি টেন্ডার সাবমিট করছি। অনেক সময় কল করে যে টেন্ডার ইস্টিমেট কস্ট জানার জন্য ১০% মিলানোর জন্য কারণ যেকোনো মূল্যে তাকে মিলাতে হবে। তখন বুঝা যায় যে সে টেন্ডার সাবমিট করবে"।[১৫১]

প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণ: ই-জিপির পোর্টালে প্রাক-যোগ্যতা সম্পর্কিত সব ফরম ও টেমপ্লেট পাওয়ার নিয়ম রয়েছে।[১৫২] ই-জিপি পোর্টালে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানেরই প্রাক-যোগ্যতা সম্পর্কিত ফরম ও টেমপ্লেট রয়েছে। যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য সব ধরনের টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়। ই-জিপি পোর্টালে সব ফরম ও টেমপ্লেট আপলোড করা হয়। টেন্ডার ওপেন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঠিকাদারের যোগ্যতা সম্পর্কিত কাগজ-পত্র ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করা হয়। সাধারণত বড় কাজ হলে প্রাক-যোগ্যতা বেশি প্রয়োজন হয়।[১৫৩]

---

[১৪১] এলজিইডি'র সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।
[১৪২] এলজিইডি, পাউবো, আরইবি ও সওজ-এর একাধিক কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।
[১৪৩] ই-জিপি গাইডলাইনের ৩.৫.৩ অনুচ্ছেদ এবং পরিশিষ্ট ২ এর ৬ নম্বরে প্রি-টেন্ডার মিটিং সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।
[১৪৪] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১৪৫] এলজিইডি'র একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১৪৬] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৪ আগস্ট ২০১৯।
[১৪৭] সওজ-এর নির্বাহী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৭ অক্টোবর ২০১৯।
[১৪৮] ই-জিপি গাইডলাইনের পরিশিষ্ট ২ এর ৬ নম্বরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে।
[১৪৯] এলজিইডি'র কয়েকজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯, এবং উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৪ আগস্ট ২০১৯।
[১৫০] এলজিইডি ও সওজ-এর কয়েকটি কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী।
[১৫১] এলজিইডি'র একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১৫২] ই-জিপি গাইডলাইনের ৩.৪.১ অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।
[১৫৩] এলজিইডি'র একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

নির্দেশক ১১: ই-বিজ্ঞাপন

ই-জিপি'র গাইডলাইনে দৈনিক পত্রিকা ও ই-জিপি পোর্টালে ক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার নিয়ম রয়েছে। দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে একটি ইংরেজি এবং একটি বাংলা জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হয়।[১৫৪]

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সব প্রতিষ্ঠানেই উল্লিখিত নিয়মগুলো অনুসরণ করা হয়। এছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডেও বিজ্ঞাপন টানিয়ে দেওয়া হয়।[১৫৫] তবে কোনো কোনো উপজেলার দরপত্র এখনো ই-জিপিতে না হওয়ায় সেগুলোর বিজ্ঞাপন ই-জিপি পোর্টালে দেওয়া হয় না, শুধু যেসব দরপত্র অনলাইনে আহ্বান করা হয় সেগুলো ই-জিপি পোর্টালে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ছোট প্রকল্পের কাজের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না।[১৫৬] সাধারণত ঠিকাদারদের কাছে দরপত্রের বিজ্ঞাপন বা নোটিশ পাঠানো হয় না।[১৫৭] তবে সচেতন ঠিকাদাররা ঠিকই খবর রাখে। কখনো কখনো মোবাইলের ম্যাসেজের মাধ্যমে জানানো হয়। নিয়ম অনুযায়ী ১৪, ২১ বা ২৮ দিন বিজ্ঞাপন লাইভে রাখতে হয়।

নির্দেশক ১২: দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

ই-জিপি'র গাইডলাইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (টিইসি) গঠন করতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী টিইসি সর্বোচ্চ তিনজন সদস্য দ্বারা গঠিত হবে, যাদের দুইজন ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান থেকে এবং একজন সদস্য অন্য একটি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান থেকে আসবেন।[১৫৮]

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো প্রতিষ্ঠানেই নিয়ম অনুযায়ী টিইসি গঠন ও দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠানভেদে প্রকল্পের আর্থিক মূল্যের ওপর ভিত্তি করে টিইসি'র সদস্য পরিবর্তন হয়।[১৫৯] এলজিইডি'র ক্ষেত্রে ১ কোটি টাকার ওপরে হলে নির্বাহী প্রকৌশলী সভাপতি এবং সহকারী প্রকৌশলী সদস্য হন। প্রকল্পের আর্থিক মূল্য ১০ কোটি টাকার ওপরে হলে একই মন্ত্রণালয়ের অন্য বিভাগের (ডিভিশন) একজনকে নিতে হয়। আবার যদি প্রকল্প ১০ কোটি টাকার ওপরের কিন্তু উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে পরিচালিত সেক্ষেত্রে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে তৃতীয় ব্যক্তিকে রাখতে হয় টিইসি'র সদস্য হিসেবে।[১৬০] উপজেলা পর্যায়ে স্কুলের কাজের ক্ষেত্রে উপজেলা প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী এবং শিক্ষা কর্মকর্তা, আর স্কুল ছাড়া অন্যান্য কাজ হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মূল্যায়ন কমিটিতে থাকেন। উপজেলা পরিষদের কাজের ক্ষেত্রে প্রধান থাকেন ইউএনও, এবং সদস্য হিসেবে উপজেলা প্রকৌশলী ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।[১৬১]

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সাধারণত চারটি ধাপে বিভক্ত - প্রাথমিক মূল্যায়ন (প্রিলিমিনারি ইভ্যালুয়েশন), কারিগরি মূল্যায়ন (টেকনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন/ টেকনিক্যাল রেসপন্সিভনেস), আর্থিক মূল্যায়ন (ফাইন্যান্সিয়াল ইভ্যালুয়েশন), এবং প্রাক-যোগ্যতা (পোস্ট কোয়ালিফিকেশন)। কোনো দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে গেলে কী কী যোগ্যতা থাকতে হবে, দরপত্রের চাহিদা অনুযায়ী সবগুলো কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে কিনা তা প্রাথমিক মূল্যায়নে দেখা হয়। কারিগরি মূল্যায়নের মাধ্যমে টার্ন ওভার, একই ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দেখা হয়। এরপর আর্থিক মূল্যায়নের জন্য ওপরের পর্যায়ে পাঠানো হয়। এরপর তার কাগজপত্রগুলো যাচাই করে দেখা হয় ঠিক আছে কিনা।

সওজ-এর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ৩০০ নম্বরের ভিত্তিতে একটি ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে কাজের সংখ্যার ওপর ১৪০ নম্বর, চলমান কাজের ওপর ১০০ নম্বর এবং মোট কত টাকার কাজ তার ওপর ৬০ নম্বর দেওয়া হয়। এই ম্যাট্রিক্সের ওপর ভিত্তি করে যিনি সর্বোচ্চ নম্বর পাবেন তিনি কাজ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন। পাউবো'র ক্ষেত্রে বার্ষিক টার্নওভার, অস্থাবর সম্পদ, একই ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা, দরপত্রের সক্ষমতা, এবং কাজের সংখ্যা - এই পাঁচটি বিষয়ের ওপর নম্বরের ভিত্তিতে ঠিকাদার চূড়ান্ত করা হয়। আরইবি'র ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

সাধারণত ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করে ক্রয় কার্যপ্রণালী অনুযায়ী ই-জিপি সিস্টেমে আপলোড করে সিস্টেমের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা রয়েছে। মূল্যায়ন করার পর ঠিকাদাররা শর্ত অনুযায়ী যেসব কাজগপত্র দরপত্র আবেদনের সাথে দেয় সেগুলোকে যাচাইয়ের জন্য স্ব স্ব অধিদপ্তরের কাছে পাঠাতে হয়। এতে অনেক সময়ক্ষেপণ হয়। এলজিইডি'র কাজের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ঠিকাদার দরপত্র জমা দেয়, ফলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। যেসব ক্ষেত্রে ১১৫ থেকে ১৩০টি পর্যন্ত দরপত্র জমা হয়, মূল্যায়নের জন্য এসব আবেদনের ব্যাংক সার্টিফিকেট দেখতে অনেক সময় ব্যয় হয়। টেন্ডার সিকিউরিটি চেক করতে একটার জন্য ২ মিনিট করে ১১৫টার জন্য ২৩০ মিনিট লাগে যা প্রায় ৪ ঘন্টা।

---

[১৫৪] দেখুন ই-জিপি গাইডলাইনের ৩.৫.১ অনুচ্ছেদ।
[১৫৫] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৪ আগস্ট ২০১৯।
[১৫৬] এলজিইডি'র একজন সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৯।
[১৫৭] এলজিইডি'র একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।
[১৫৮] দেখুন ই-জিপি গাইডলাইনের ৩.৬.১ অনুচ্ছেদ ও পরিশিষ্ট ২ এর ৪ নম্বর।
[১৫৯] এলজিইডি'র একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।
[১৬০] এলজিইডি'র একজন সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৯।
[১৬১] এলজিইডি'র একাধিক উপজেলা প্রকৌশলীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৪ আগস্ট ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

ঠিকাদারদের কাগজপত্র পূর্ণাঙ্গভাবে যাচাই-বাছাই করার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যারা দরপত্র জমা দেয় তাদের কারও সব কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করা হয় না। তবে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে লটারির পর নির্বাচিত ঠিকাদারের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়। কাগজপত্র ঠিক থাকলে কাজ দেওয়া হয়, আর না হলে পুনরায় লটারি করা হয়।[১৬২] সার্টিফিকেট যাচাই সম্পর্কে একজন ঠিকাদার বলেন, "মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনেক সময় সার্টিফিকেট ভেরিফাই করা হয় না। শুধু সার্টিফিকেটের সংখ্যা গুণেই নম্বর দেওয়া হয়। ফলে একজনের সার্টিফিকেট আরেকজন ব্যবহার করার রিস্ক থেকে যায়"।[১৬৩]

কোনো কোনে সময়ে মূল্যায়ন সঠিকভাবে হয় না। একজন প্রকৌশলীর মতে ঠিকাদারদের ব্ল্যাক লিস্ট না থাকা, চলমান কাজ ও পূর্ব কাজের হিসাব না থাকা এবং ঠিকাদার ওভারলোডেড কিনা সেটা না জানা থাকার জন্য সঠিক ব্যক্তির সাথে টেন্ডার হয় না। কেননা অভিজ্ঞতার কাগজপত্রে সমস্যা থাকে আবার অন্যের সার্টিফিকেটও ব্যবহার করে।[১৬৪] ঠিকাদারদের মতে মূল্যায়নের শর্তের কারণে বড় ঠিকাদারেরা কাজ পাচ্ছেন। একজন ঠিকাদার বলেন, "ঠিকাদারদের সিলেকশন প্রক্রিয়া ফেয়ার থাকলেও সমস্যা আছে পিপিআরে। ই-জিপির সিলেকশন ক্রাইটেরিয়ার কারণে বড় ঠিকাদারেরাই কাজ পাচ্ছে। তুলনামূলক ছোট ঠিকাদারেরা কাজ পাচ্ছে না। এটা একটা নিয়ম হয়ে গেছে যে (জনৈক ঠিকাদার) দরপত্র দিলে আর কেউ পাবে না"।[১৬৫] গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো এলাকায় দেখা যায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে শুধু নির্দিষ্ট কিছু ঠিকাদার বারবার কাজ পায়। অন্যরাও ব্যবহার করে বলে তাঁর লাইসেন্স আপগ্রেড হয়ে যায়। ফলে তিনি একাই বারবার কাজ পান, এবং অন্য কেউ তাদের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে না। এর ফলে ধনী ঠিকাদার আরও ধনী হয়।

নির্দেশক ১৩: সিদ্ধান্ত গ্রহণ

নিয়ম অনুযায়ী ই-জিপি পোর্টালে ক্রয় সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত বিশেষকরে নির্বাচিত ঠিকাদারকে নোটিশ পাঠানো এবং চুক্তি সম্পর্কিত বিষয় প্রকাশ করতে হয়।[১৬৬] মূল্যায়ন শেষে যে ঠিকাদার সকল বিবেচনায় যোগ্য বিবেচিত হন তাকে কাজের জন্য চূড়ান্ত বাছাই করা হয়। চূড়ান্তভাবে বাছাইকৃত ঠিকাদার বা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ই-জিপি সিস্টেমে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়।[১৬৭] চুক্তি হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট নথি সিপিটিইউ ও সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

দরপত্র আবেদন সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার পর যে প্রতিবেদন দেওয়া হয় তা অনুমোদন কমিটির কাছে পাঠানো হয়। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচিত ঠিকাদারকে খুদেবার্তা দিয়ে জানানো হয় বা ফোন দেওয়া হয়। তাকে রেসপন্স করার জন্য এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়। যদি সে এক সপ্তাহের মধ্যে রেসপন্স না করে তাহলে টেন্ডার ডিক্লাইন করে পূণরায় ডাকা হয়।'[১৬৮] যেসব প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ পায় তাদের সকলের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং যেসব প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ পায় না সেসব প্রাতষ্ঠানের নাম সবসময় প্রকাশ করা হয় না। চুক্তির ক্ষেত্রে ম্যানুয়ালী ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন হয়। কাজের চুক্তির স্ক্যান কপি ই-জিপি সিস্টেমে আপলোড করা হয়। ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পর্কে একজন প্রকৌশলী বলেন 'সব শেষে চুক্তি করা হয়। চুক্তির ক্ষেত্রে তিনশ টাকার স্ট্যাম্পে ম্যানুয়ালী সম্পাদন করা হয়। তবে চুক্তিটা ই-জিপিতে আপলোড করতে হয়।'[১৬৯] যারা অংশগ্রহণ করার পরও নির্বাচিত হন না তাদের সাধারণত কারণ জানানো হয় না, তবে কেউ জানতে চাইলে জানানো হয়।[১৭০]

৪.৪. ক্ষেত্র ৩: ই-জিপি ব্যবস্থাপনা

এই ক্ষেত্রে সব প্রতিষ্ঠানই সবগুলো নির্দেশকে নিম্ন স্কোর পেয়েছে বলে দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে সব প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি উদ্বেগজনক।

নির্দেশক ১৪: ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা

ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদারদের ই-জিপি ব্যবস্থায় কর্ম-পরিকল্পনা দাখিল করতে হয়। এছাড়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে ঠিকাদারকে ই-জিপি চুক্তি ব্যবস্থাপনা টুলস ব্যবহার করতে হয়। ই-জিপি ব্যবস্থায় কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য, পরীবিক্ষণ প্রতিবেদন, ছবি ও অন্যান্য নথি আপলোড করার নিয়ম রয়েছে।[১৭১]

তবে গবেষণায় দেখা গেছে ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা কোনো প্রতিষ্ঠানেই এখনো বাস্তবায়ন হয় নি - কেবল চুক্তি পর্যন্ত ই-জিপিতে কার্য সম্পাদন করা হয়।[১৭২] প্রায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই স্ট্যাম্পে সম্পাদিত চুক্তির সাথে ঠিকাদার একটি সম্ভাব্য কর্ম-পরিকল্পনা দাখিল

[১৬২] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১৬৩] একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১৬৪] এলজিইডি'র একজন সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৯।
[১৬৫] একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১৬৬] গাইডলানের ৩.৭ অনুচ্ছেদে এবং পরিশিষ্টের ১৭, ১৮, ১৯ নম্বরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।
[১৬৭] এলজিইডি'র সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৪ আগস্ট, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১৬৮] এলজিইডি'র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৯।
[১৬৯] *প্রাগুক্ত*।
[১৭০] এলজিইডি'র একাধিক কর্মকর্তার তথ্য অনুযায়ী।
[১৭১] ই-জিপি গাইডলাইনের ৩.৮.১.৪ অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।
[১৭২] এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৪ আগস্ট ২০১৯।

করেন, তবে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সব সময় কাজ হয় না।[১৭৩] কাজের পরিকল্পনা সম্পর্কে একজন ঠিকাদার বলেন, "কার্যালয় থেকে ওয়ার্ক প্লান চায়। এগুলো হচ্ছে জাস্ট শো মাত্র"।[১৭৪]

নির্দেশক ১৫: কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি

ই-জিপি প্রক্রিয়ায় কাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়া থাকার কথা রয়েছে। যেসব নথি ই-জিপির সাথে সম্পর্কিত, যেমন পরিদর্শন প্রতিবেদন, ফটোগ্রাফ প্রভৃতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ওয়েবসাইটে আপালোড করার বিষয়ে গাইড লাইনে বলা হয়েছে। এছাড়া কাজের ক্ষেত্রে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে 'অটো অ্যালার্টে'র ব্যবস্থাও ই-জিপি প্রক্রিয়ায় থাকার কথা।[১৭৫]

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে এই প্রক্রিয়াটি এখানো ই-জিপি ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয় নি। তবে কার্যালয়গুলোকে তাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হয়। অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে সেজন্য জবাবদিহিও করতে হয় বলে জানা যায়।[১৭৬] কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চুক্তির সময় বাড়ানো একটা বড় ধরনের সমস্যা। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে অনানুষ্ঠানিকভাবে চুক্তির সময় বাড়িয়ে নেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়।[১৭৭]

৪.৫. ক্ষেত্র ৪: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রের অধীনে তিনটি নির্দেশকে সবচেয়ে বেশি স্কোর পেয়েছে সওজ (৩০%); এর পরেই রয়েছে এলজিইডি (২৫%)। এই তুলনায় আরইবি (২০%) ও পাউবো'র (১৯%) স্কোর এক্ষেত্রে বেশ কম (চিত্র ৯ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৯: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

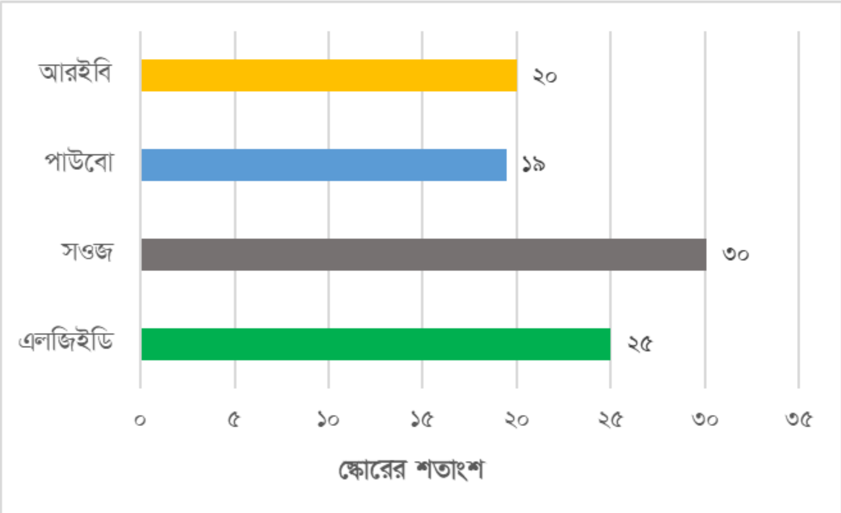

নির্দেশক ১৬: অভিযোগ নিষ্পত্তি

ই-জিপি'র গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিটি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা থাকতে হবে।[১৭৮] সাধারণত চিঠি ও ফোন কলের মাধ্যমে, অনলাইনে কিংবা সরাসরি যে কেউ অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলজিইডি ও সওজ কার্যালয়গুলোতে কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বিদ্যমান। এসব প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দাখিল করা যায় এবং দাখিলকৃত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যদিকে পাউবো ও আরইবি'তে অভিযোগ করলে সমাধান না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পাউবো'তে অভিযোগ দাখিল সম্পর্কে একজন ঠিকাদার জানান অনলাইনে অভিযোগ করলে সাড়া মেলে না। ল্যান্ড ফোনে অভিযোগ করলে পাওয়া যায়, তবে যিনি টেন্ডার কল করেছেন তাকে পাওয়া যায় না। অনেক সময় তিনি সাইটে থাকেন। ম্যানুয়াল অভিযোগ করলে সমাধান হয়।[১৭৯]

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রয় সংক্রান্ত সরাসরি অভিযোগ বেশি আসে না বলে দেখা যায়। যেমন সওজ-এর ২০২০ সালে অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা চারটি, তবে অভিযোগের ধরন সম্পর্কে জানা যায় নি।[১৮০] সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে

---

[১৭৩] এলজিইডি'র একাধিক কার্যালয়ের একাধিক পর্যায়ের প্রকৌশলীর তথ্য অনুযায়ী।
[১৭৪] একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১৭৫] ই-জিপি গাইডলাইনের ৩.৮.৩.৩ অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।
[১৭৬] এলজিইডি'র সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।
[১৭৭] এলজিইডি'র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৯।
[১৭৮] ই-জিপি গাইডলাইনের ৩.৯.৬.৩ অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।
[১৭৯] একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৪ আগস্ট ২০১৯।
[১৮০] দেখুন সওজ-এর ওয়েবসাইট, http://www.rthd.gov.bd/sites/default/files/files/rthd.portal.gov.bd/reports/980095e2_169d_4a6b_809d_3e50690b8438/2020-08-24-15-02-cf0c5123ff5b1cc4a03539983a45d6bd.pdf (২৪ আগস্ট ২০২০)।

ঠিকাদারদের পক্ষ থেকে কোনো রকমের অভিযোগ পাওয়া যায় না, যেহেতু এমন ঠিকাদার খুব কমই আছেন যিনি ই-জিপি সম্পর্কে জানেন না।[১৮১] তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিকাদারেরা কিছু কিছু বিষয়ে জানতে চাইলে কিংবা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তার সমাধান চান। এ প্রসঙ্গে একজন উপজেলা প্রকৌশলী বলেন, "মনের মত না হলে ঠিকাদাররা আপিল করে, তখন আমরা সেগুলোর সমাধান করে থাকি"।[১৮২] অভিযোগ সম্পর্কে একজন উপজেলা প্রকৌশলী বলেন, "একজন এসে অভিযোগ দিয়েছে যে আমি লোয়েস্ট হওয়ার পরও কেন কাজ পাব না? তখন আমি বললাম যে সে জয়েন ভেন্চার করেছে। তো সে কাগজপত্রে সাইন করে নাই কিন্তু তার পার্টনার সাইন করেছে। তখন সে আমাকে টাকা দিতে চাইলো, 'আমাকে কাজ দেন আমি টাকা দিব'। কিন্তু আমি তো এটা চাইলেই দিতে পারবোনা, সিস্টেমে দিতে হবে।'[১৮৩]

নির্দেশক ১৭: নিরীক্ষা

ই-জিপি প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিধি অনুযায়ী নিয়মিত নিরীক্ষা করতে হয়। ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী[১৮৪] প্রত্যেক ব্যবহারকারীর লগ-ইন থেকে লগ-আউট পর্যন্ত সকল কার্যক্রম ভবিষ্যৎ নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারীর পরিচয়, তারিখ ও সময়সহ 'অডিট ট্রেইল ডাটাবেজে' সংরক্ষিত থাকবে। সিপিটিইউ'র অনুমোদিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কেবল অনুমোদিত নিরীক্ষক বিশেষ অনুমতিতে অডিট লগে প্রবেশ করতে পারবে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই নিয়মিত নিরীক্ষা হয়ে থাকে। সব কার্যালয়েই অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরীক্ষা হয়ে থাকে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কার্যক্রমের ন্যায় ই-জিপি'তে সরকারি ক্রয় সম্পর্কিত কার্যক্রমও নিরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আবেদনের প্রেক্ষিতে সাধারণ জনগণের অভিগম্যতা রয়েছে। তবে এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা আপত্তির জবাবসহ অভ্যন্তরীণভাবে প্রকাশ করা হয়, কিন্তু জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয় না। কোনো নিরীক্ষা আপত্তি সাথে সাথে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা হয়, যদিও মাঝে মাঝে দেরি হয়ে যায়। এলজিইডি'র ক্ষেত্রে এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অডিট সেল থেকে প্রতিবছর নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর জন্য আলাদা করে প্রতিবেদন হয় না, শুধু কি কি আপত্তি উঠছে সেগুলো জানানো হয় এবং সেগুলোর জবাব দিতে বলা হয়। আপত্তির প্রেক্ষিতে জবাব দিতে না পারলে যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে বেতন বন্ধ করা, পেনশন বন্ধ করা ও চাকরিচ্যুত করা। নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। তবে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা তুলনামূলকভাবে কম হয় বলে জানা যায়।[১৮৫]

গবেষণা অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে সরাসরি ই-জিপি প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে অডিট আপত্তি আসে না। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ক্রয় সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিয়ে আপত্তি আসে। এগুলোও কার্যালয় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ একজন উপজেলা প্রকৌশলী বলেন, "অডিট হয়ই মূলত আমাদের ভ্যাট ট্যাক্স কম বেশি হওয়ার কারণে। কারণ একেক কাজের একেক ধরনের ভ্যাট। যেমন আমি একটাতে ভ্যাট কাটছি ৭% কিন্তু সেটাতে ভ্যাট কাটার কথা ছিল ১৫%। ১৪ লাখ টাকার কাজ। আমার ২ লাখ টাকার ডিপোজিট কাটছিল। কিন্তু এটা আমি সমাধান করছি ঠিকাদারের যে ১০% রাখাছিল সেটার থেকে কাটতে হয়েছিল। এগুলো কতদিন পর নিষ্পত্তি হয় তা জানিনা তবে আমরা পাঠায়া দেই। '[১৮৬]

তবে ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী সিস্টেমে অডিট লগ রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা থাকলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানই এটি মেনে চলে না। নিরীক্ষা করার সময় ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করা হয় না, বরং কাগজে-কলমে ই-জিপি কার্যক্রমের নিরীক্ষা করা হয়।

নির্দেশক ১৮: সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ

সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি ১৯৭৯ অনুযায়ী সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর সম্পদের বিবরণী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দাখিল করতে হয়।[১৮৭] তবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই তাদের সম্পদের হালনাগাদ তথ্য দাখিল করেন না বা তাদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ করেন না। তাঁদের মতে চাকরিতে প্রবেশের সময় সম্পদের হিসাবসংক্রান্ত একটি ফরম তাঁরা পূরণ করেছেন। পাশাপাশি আয়কর প্রদান করার সময় সম্পত্তির বিবরণ দিতে হয়। প্রতিবছর আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন বলে এটি করার প্রয়োজন নেই।[১৮৮] আরও জানা যায়, ২০০৭-২০০৮ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে একবার সম্পদের হিসাব বিবরণী জমা দিয়েছের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

৪.৬. ক্ষেত্র ৫: কার্যকরতা

কার্যকরতার ক্ষেত্রের অধীনে দুইটি নির্দেশকে কোনো প্রতিষ্ঠানই কোনো স্কোর পায় নি।

নির্দেশক ১৯: ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে দুর্নীতি হ্রাস

---

[১৮১] এলজিইডি'র একজন সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৯।
[১৮২] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৪ আগস্ট ২০১৯।
[১৮৩] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১৮৪] ই-জিপি গাইডলাইনের ৩.৯.৬.১ অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।
[১৮৫] এলজিইডি'র বিভিন্ন পর্যায়ের ও কার্যালয়ের প্রকৌশলীদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৭ সেপ্টেম্বর, ৯ অক্টোবর ২০১৯।
[১৮৬] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১৮৭] সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯-এর ১৩ নং ধারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।
[১৮৮] এলজিইডি'র বিভিন্ন পর্যায়ের ও কার্যালয়ের প্রকৌশলীদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৪ ও ৬ আগস্ট ২০১৯।

ই-জিপি'র অন্যতম প্রধান লক্ষ্য সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া সহজতর করা এবং সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি হ্রাস করা। তবে ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে কিনা এ বিষয়ে পরস্পরবিরোধী মতামত পাওয়া গেছে। কোনো কোনো কর্মকর্তার মতে ই-জিপি'র কারণে দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী আগে যেমন দরপত্রের বাক্স ছিনতাই, দরপত্র জমা দিতে না দেওয়া, কার্যালয়ে এসে ঘেরাও করা ইত্যাদি ঘটনা ঘটতো, সেগুলো এখন আর হয় না। এছাড়া অনেকের মতে আগে যেভাবে কাগজপত্র পরিবর্তন করা যেতো, ই-জিপি প্রবর্তনের পরে তা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী বলেন, "দুর্নীতি কমেছে। আগে যেভাবে কাগজে ঘষা-মাজা করা যেতো, এখন করা যায় না। একসময় আমি চাইলে যে কাউকে কাজ দিতে পারতাম। এখন এই সুযোগটা নাই। সেই হিসেবে বলা যায় এখন নিরপেক্ষভাবেই ঠিকাদার সিলেক্ট হয়।'[১৮৯] অর্থাৎ তাঁদের মতে দরপত্র প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি নেই - নিরপেক্ষভাবে ঠিকাদার নির্বাচনই একমাত্র দুর্নীতি যা করার সুযোগ ই-জিপি'তে নেই।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতে ঠিকাদার নির্ধারণ বা বাছাই প্রক্রিয়া এখন আগের চাইতে অনেক বেশি স্বচ্ছ। ঠিকাদার বাছাই সম্পর্কে তাঁদের মতে এখন কারোরই কথা বলার সুযোগ নেই। চাহিদা অনুযায়ী যেসব কাগজপত্র জমা হয় তার ভিত্তিতেই ঠিকাদার নির্বাচিত হয় বলে তাঁদের অভিমত। এ প্রসঙ্গে একজন নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন, "ঠিকাদারদের মধ্যে নেগোসিয়েশন বিষয়টা আগে ছিল যখন টেন্ডারগুলো ম্যানুয়াল ছিল। কিন্তু ই-জিপি হয়ে যাওয়ার পর এটা হওয়ার সম্ভাবনা নাই"।[১৯০]

তবে এর বিপরীতে অনেক কর্মকর্তার মতেই দুর্নীতি হ্রাসের সাথে ই-জিপি'র সম্পর্ক তেমন নেই।[১৯১] গবেষণায় ই-জিপি প্রবর্তনের পর বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির কয়েকটি ধরন লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে ঠিকাদারদের মধ্যে যোগসাজশ, কর্মকর্তা কর্তৃক ঠিকাদারদের রেট শিডিউল জানিয়ে দেওয়া, কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটরদের সাহায্যে নিয়ম-বহির্ভূত কাজ করানো, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, কাজ বিক্রি করে দেওয়া বা সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া, একজনের লাইসেন্সে কাজ নিয়ে অন্য জনের কাজ করা, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে ঘুষ দেওয়া, অগ্রগতি প্রতিবেদনে ভুল তথ্য দেওয়া, এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে চাঁদা দেওয়া, রাজনৈতিকভাবে কাজের নিয়ন্ত্রণ ও ঠিকাদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার বাইরের ঠিকাদারদের কাজ করতে না দেওয়া ইত্যাদি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। নিচে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো।

রাজনৈতিক প্রভাব/ নিয়ন্ত্রণ: কিছু কিছু এলাকায় কোন বিশেষ কাজে কারা দরপত্র জমা দেবে তা সংশ্লিষ্ট এলাকার ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতা বিশেষকরে স্থানীয় সংসদ সদস্য ঠিক করে দেন। অনেক ক্ষেত্রে একটি বড় লাইসেন্সের অধীনে কাজ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা তার কর্মীদের মাঝে বণ্টন করে। তথ্যদাতাদের মতে সাধারণত কোনো এলাকায় কাজ আসলে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য, পৌরসভার মেয়র বা উপজেলা চেয়ারম্যান কাজটা তার অনুগামী ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ করে দেন। তাঁদের মতে এটি পুরো বাংলাদেশেরই চিত্র। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মনোনীত ঠিকাদার যদি কাজ না পায় তাহলে তিনি ঠিকাদারকে বলে দেন তাঁর মনোনীত কোনো ব্যক্তিকে এত শতাংশ টাকা দিতে বা কাজ দিতে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো সংসদ সদস্য কমিশন নেন বা কোনো কোনো সংসদ সদস্য থোক অর্থ নেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।[১৯২] এছাড়াও একটি কাজকে প্যাকেজে ভাগ করে দেওয়া হয়। যেমন ১০ কোটি টাকার একটা কাজ পাঁচজনকে বলা হয় করার জন্য। এজন্য কাজটিকে পাঁচটা আলাদা প্যাকেজে ভাগ করা হয়, কিন্তু এক লাইসেন্সের অধীনে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। তবে যিনি মূল ঠিকাদার (যার নামে লাইসেন্স আছে) তাকে অনেক সময় জনপ্রতিনিধিদের কমিশন দিতে হয় না। জনপ্রতিনিধিরা মূল ঠিকাদারের সাথে তাদের ৪/৫ জনকে দলের কর্মী হিসেবে দিয়ে দেয় তাদেরকে কাজ দেওয়ার জন্য।[১৯৩] এ প্রসঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের একজন স্থানীয় নেতার ভাষায়, "মেয়র সাহেব যাকে পছন্দ করে সেই কাজ পাবে। এরপর সিটি কর্পোরেশনের লটারিতেও একটা সমস্যা আছে"।[১৯৪]

রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে দেশের অনেক জেলায় সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে বা তাদের সাথে সমঝোতা না করে কাজ করা যায় না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বাধ্য হয়ে চাঁদা দিতে হয়, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাইরের ঠিকাদারদের কাজ করতে দেওয়া হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাকে কত কাজের বাজেটের শতাংশ দিতে হবে তা নির্ধারিত থাকে। যেমন গবেষণায় দেখা গেছে একটি জেলায় ঘুরে-ফিরে তিন-চারটি লাইসেন্সে কাজ করা হয়। তা না হলে ঐ ঠিকাদারকে কাজ করতে দেওয়া হবে না। এই জেলায় অন্য জেলার কোনো ঠিকাদার কাজ পেলে তাকে এই জেলার স্থানীয় ঠিকাদারদের সাথে সমঝোতায় আসতে হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য বলে দেন কার কার সাথে কি আলোচনা বা সমঝোতা করতে হবে। জানা গেছে এই জেলায় কাজ করতে হলে কমপক্ষে ৬-৭ শতাংশ ব্যয় করতে হবে - সংসদ সদস্য-নির্ধারিত ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধিকে ২ শতাংশ, স্থানীয় দলীয় কমিটিতে যারা আছে তাদের ১ শতাংশ, অন্য ঠিকাদারদের ২ শতাংশ এবং কর্মকর্তাদের ২ শতাংশ দিতে হয়।[১৯৫]

রাজনৈতিক প্রভাব আছে বলেই কোনো কোনো ঠিকাদার নিয়মিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজ পান। এক্ষেত্রে অন্যান্য ঠিকাদারদেরকে দরপত্র জমা দিতে না দেওয়া, বা কোনোভাবে বিরত রাখা - সেটা দর-কষাকষি বা প্রভাব ইত্যাদি মাধ্যমে হয়ে থাকে।[১৯৬] এমনকি

[১৮৯] এলজিইডি'র বিভিন্ন পর্যায়ের ও কার্যালয়ের প্রকৌশলীদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ও ৯ অক্টোবর ২০১৯।
[১৯০] এলজিইডি'র একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৯।
[১৯১] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৪ আগস্ট ২০১৯।
[১৯২] একটি জাতীয় দৈনিকের স্থানীয় সংবাদদাতা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৭ আগস্ট ২০১৯।
[১৯৩] একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৮ আগস্ট ২০১৯।
[১৯৪] একজন স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের নেতা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[১৯৫] একটি কম্পিউটার দোকানের মালিক, যিনি ঠিকাদারদের হয়ে নিয়মিত দরপত্র জমা দেন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।
[১৯৬] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৭ অক্টোবর ২০১৯।

রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে যে কাজ পায় তাকে কাজ ছাড়তে বাধ্য করার অভিযোগও পাওয়া যায়।[১৯৭] উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পাউবো'র প্রায় সব প্রকল্পই ১১টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো সিন্ডিকেট করে নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগবাটোয়ারা করে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সব ধরনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বাইরের কোনো ঠিকাদার দরপত্রে অংশ নিতে পারেন না। ২০১৯ সালের ২২ ডিসেম্বর পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া একটি অগ্রগতি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ১১টি প্রতিষ্ঠানের হাতে ছোট-বড় মোট ৪১৬টি প্রকল্পের কাজ চলমান।[১৯৮]

সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ই-জিপি প্রক্রিয়ার কয়েকটি পর্যায়ে বেশ কিছু দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়।

রেট শিডিউল জানিয়ে দেওয়া: অনেক ক্ষেত্রে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ঠিকাদারদের রেট শিডিউল জানিয়ে দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে তারা অনেকেই জানে কোন কোন ঠিকাদার দরপত্র জমা দিয়েছে। ঠিকাদারেরা অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মীদের মাধ্যমে রেট শিডিউল জেনে নেন। অনেক প্রকৌশলীর কাছে ঠিকাদারদের পাসওয়ার্ড থাকে, এবং সুযোগ-সুবিধা বুঝে কোনো কোনো ঠিকাদারকে রেট সম্পর্কে জানিয়ে দেন। এক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে যে যাদের আর্থিক সামর্থ আছে তারা রেট জেনে যান বিভিন্ন মাধ্যমে। এমনকি এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে যে কোনো নির্দিষ্ট কার্যালয়ে ৫০০ টাকার বিনিময়ে এস্টিমেট পাওয়া যায়।

কম্পিউটার অপারেটরদের নিয়ম-বহির্ভূত কাজ: সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটরদের সাহায্যে নিয়ম-বহির্ভূত কাজ করানোর ফলে দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি হয়। প্রায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই কম্পিউটার অপারেটরই দরপত্র খোলা, মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন শিট তৈরি করাসহ সকল কাজ করেন। এজন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ক্রয়কারীর (প্রকিউরিং এনটিটি - পিই) আইডি, পাসওয়ার্ড কম্পিউটার অপারেটরকে দেওয়া থাকে। কোথাও কোথাও সহকারী প্রকৌশলীরাও পিই'র পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে। এ প্রসঙ্গে একজন প্রকৌশলী বলেন, "আসলে পাসওয়ার্ড আমাদের নামে হলেও আমার কম্পিউটার অপারেটরই সব কাজ করে। আমাদেরতো এতো সময় দেয়া সম্ভব না"।[১৯৯]

ঠিকাদারদের একাংশ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটরকে দিয়ে দরপত্র জমা দেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ৩,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা আর সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে ১,৫০০ থেকে ২,০০০ টাকার বিনিময়ে দরপত্র জমা দেওয়ার কাজ করেন কম্পিউটার অপারেটররা। এছাড়া যাদের সাথে ভালো সম্পর্ক সেসব ঠিকাদারকে ১০% এর প্রাক্কলিত মূল্য জানিয়ে দেন।[২০০] এছাড়া ই-জিপি প্রচলনের শুরুর দিকে অনেক ঠিকাদারের নিবন্ধন করে দিয়েছেন অর্থের বিনিময়ে। একজন কম্পিউটার অপারেটরের ভাষায়, "এলজিইডি'তে আমি অনেক আইডি করে দিছি - একশ-দেড়শটা আইডি হবে। আইডি খোলার জন্য ব্যাংকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হতো। আমিও প্রথম প্রথম তো অনেক টাকা নিতাম। এইতো ৮/১০ হাজার টাকা। আর এখন মনে করেন ৭ হাজার ৮ হাজার টাকা। আর এই জন্য দোকান খুলছে, ফার্ম আছে। ... এখনও অনেকে ঠিকাদার আছে টেন্ডার কিভাবে ফিলআপ করতে হবে সেটাই বুঝে না"।[২০১]

দরপত্র মূল্যায়নে দুর্নীতি: দরপত্র মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহেলা, নিজেরা কাজ না করে কম্পিউটার অপারেটরদের মাধ্যমে মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করানো, নম্বর বাড়িয়ে-কমিয়ে কোনো কোনো ঠিকাদারকে আনুকূল্য দেওয়া ইত্যাদির অভিযোগ পাওয়া যায়।

বক্স ১: দরপত্র মূল্যায়নে দুর্নীতি

"লাস্টে যে কাজটা ছিল সেটা ছিল ৫০ লাখ টাকার। ঐটাতে টেন্ডার পড়ছিল তিনটা। ... এক নাম্বার ও দুই নাম্বারকে বাদ দিয়ে ৩ নাম্বার ...এর নামে সিএস পাঠাইছে। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে আসলে সে অ্যাপ্রুভ করবে। আমার বাসার কাছেই ওনার বাসা। আমি প্রায়ই খোঁজ-খবর নিতাম। আমি জানি যে কাজটা আমি পাব, আমার ভেলু অফ ওয়ার্ক বেশি। কোনো ভুলের কারণে আমি মিস গেলে তাহলে ... কাজ পাবে। কিন্তু ... এর পাওয়ার কোনো কথাই না। কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়ার তো দেখতে পারে। উনি দেখলো যে কোনো জায়গায় নন-রেসপন্সিবল লেখে নাই। বিষয়টা ওনাকে সরাসরি বললাম। যারা সিএস পাঠাইছে তাদের কাছে এর ব্যাখ্যা চাইলো। উনি গড়িমসি করে পুনরায় টেন্ডার রিভিউ করার জন্য আদেশ দিল।"

- একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রাপ্ত অভিযোগ অনুযায়ী, টিইসি দরপত্রের নথি যাচাই-বাছাই করার সময় ইচ্ছা করে কিছু কাগজপত্র সিস্টেম থেকে মুছে দেয়, যেন তাদের পছন্দের কোনো ঠিকাদারই কাজটি পায়। তিন সদস্যের টিইসি'র দ্বারা মূল্যায়ন করার কথা থাকলেও কখনো প্রকৌশলী, কখনো সহকারী প্রকৌশলী, আবার কখনো কম্পিউটার অপারেটর মূল্যায়ন করে। টিইসি'র পছন্দের ব্যক্তিকে কাজ

---

[১৯৭] এলজিইডি'র একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।
[১৯৮] *দৈনিক যুগান্তর*, 'প্রকল্পে পদে পদে অনিয়ম: পাউবো জিম্মি ১১ ঠিকাদারে', ২৮ জুন ২০২০, https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/320276/ (২৫ আগস্ট ২০২০)।
[১৯৯] আরইবি'র একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[২০০] একটি কম্পিউটার দোকানের মালিক, যিনি ঠিকাদারদের হয়ে নিয়মিত দরপত্র জমা দেন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ, ৬ আগস্ট ২০১৯।
[২০১] সওজ-এর একজন কম্পিউটার অপারেটর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

দেওয়ার জন্য মূল্যায়ন করার পর যে স্টেটমেন্ট তৈরি করে সেখানে ১ বা ২ নম্বরের হেরফের করতে পারে। যেমন সনদের সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেখানো যায়, তবে চলমান কাজ বা কাজের মূল্যের নম্বর কমানো বা বাড়ানোর সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে একজন ঠিকাদার বলেন, "মার্কিং করার সিস্টেম হচ্ছে সেটা তো সার্টিফিকেট দিয়ে করে। এটা যদি একজন ইঞ্জিনিয়ার ইচ্ছা করে ২/৪ মার্কস বাড়ায়া দিতে পারে।"[২০২]

দরপত্রের সাথে সংযুক্ত নথির সবগুলো যাচাই-বাছাই করা হয় না বলেও অভিযোগ রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতে অনেকে ভুয়া কাগজপত্র দেয় - তাদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ থাকে বলে এগুলো যাচাই করা হয় না। এছাড়া ওএসটিইটিএম পদ্ধতিতে টিইসি'র পছন্দের লোক ছাড়া কাজ দেয় না বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়।

অবৈধ অর্থ আদায়: গবেষণায় বিভিন্ন পর্যায়ে ঠিকাদারদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের একাংশ অবৈধভাবে অর্থ আদায় করে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

প্রথমত, প্রাপ্ত অভিযোগ অনুযায়ী কার্যাদেশ আনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অর্থ দিতে হয়, না হলে কাজ পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে কমিশনের হার নির্দিষ্ট করা আছে - প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী যা প্রতিষ্ঠানভেদে ০.২৫% থেকে শুরু করে ৫% পর্যন্ত। পরবর্তীতে ল্যাবরেটরি টেস্টের সময়ও অর্থ দিতে হয়। তবে কোনো কোনো প্রকৌশলী এ ধরনের অর্থ নেন না বলেও জানা যায়। এছাড়া এলটিএম পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে এস্টিমেট সংগ্রহ করা হয়। সে কারণে সবাই ১০% লেস দেওয়ার ফলে সবার একই দর হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কর্মকর্তাদেরকে যে ঠিকাদার বেশি টাকা দিতে পারেন তাকেই কাজটি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।[২০৩]

কাজ বাস্তবায়নের সময় তদারকির ক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা অবৈধভাবে অর্থ আদায় করেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। কাজ বাস্তবায়নের শুরুতে কাজের গুনগত মান নিয়ে প্রশ্ন থাকে। সেক্ষেত্রে ঠিকাদার এবং প্রকৌশলীদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়। ঠিকাদারদের তথ্য অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নের সময় প্রকৌশলীদের আর্থিক সুবিধা দিতে হয়, এবং এই ক্ষতি কাজের মানের সাথে আপোষ করে পুষিয়ে নেওয়া হয়। এ কারণে মাঠ পরিদর্শন করা হলেও কাজের গুণগত মান ভালো হয় না। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে এটি না হলে কাজের ক্ষেত্রে ভুল ধরে টাকা চাওয়া হয়। পরবর্তীতে যেকোনো সমস্যা দেখিয়ে বিল আটকে দেওয়া হয়। টেস্টের রিপোর্টও ঠিকমত আসবে না।[২০৪] তবে সব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ নেই।

বক্স ২: কার্যাদেশ প্রদানে দুর্নীতি

"২০১৬-তে আমি একটা কাজ পাইলাম। সেখানে ঠিকাদারদের তো আমি চিনি, কিন্তু ঐ প্রকিউরিং এনটিটি তো আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনে না। সদরের উপজেলা আমাকে কল করছে যে আপনি যে আপনি প্রজেক্ট পাইতে পারেন। তো উনি আমাকে একটা নাম্বার দিছে যে আপনি ওনার সাথে কন্ট্রাক্ট করেন। উপজেলা অফিস থেকে বললো যে আপনি তো সেকেন্ড হইছেন, আপনি যদি প্রস্তুতি নেন আমরা আপনাকে টেন্ডার দিব। আপনার যে পিডব্লিউডি'র সার্টিফিকেট সেটা আমরা যাচাই করে আপনার মেইল আইডিতে পাঠায়া দিব। আমি বললাম যে আমি তো সেকেন্ড হইছি। আমার এত ইন্টারেস্টও নাই যে আপনাকে পার্সেন্টেজ দিয়ে কাজ নিব। উনি বলল যে দেখেন যিনি ফার্স্ট হইছে তার পারফমেন্স ভাল না। সেজন্যই আমরা মূলত আপনাকে দিয়ে কাজটা করাইতে চাই। বেশ কিছু কাজ হ্যাংগিং আছে, এই জন্য আমরা তাকে কাজটা দিব না বলে সিদ্ধান্ত নিছি। আমি চিন্তাই করতে পারতেছি না যে ৪/৫ লাখ টাকার ডিফারেন্স হয়ে কিভাবে আমি কাজটা পাব? পরে আমাকে ঐ কাজটা দিছে। টাকা পয়সা দিতে হইছে। আমার কাছে ঐভাবে কোনো ডিমান্ড ছিল না যে এত পার্সেন্টেজ দিতে হবে, তবে দিছি।"

- একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ঠিকাদারদের মতে ই-জিপি প্রবর্তনের পর 'টেন্ডারবাজি' বন্ধ হলেও টাকা লেন-দেন এখনো সেভাবেই রয়ে গেছে, বরং এর পরিমাণ বেড়েছে। এই অবৈধ অর্থ আদায়ের পথ নিচ থেকে শুরু করে ওপরের পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বিল তোলার সময়ও ৫%-১০% পর্যন্ত অর্থ দিতে হয়। কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য বিলের ২%-৫% পর্যন্ত অর্থ আদায় করা হয়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে এই হার নির্ধারিত। যেমন, প্রকৌশলীকে ১%, সাব অ্যাসিস্টেন্ট প্রকৌশলীকে ০.৫%, আর উপজেলা প্রকৌশলীকে ১% দিতে হয়। এছাড়া বিল উত্তোলনের সময় টিইসি'কে ২%, অনুমোদন কমিটিকে ১%, এসই এবং তার অফিস সহকারীকে, এবং কাজ শেষে বিল উত্তোলনের সময় হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে ২%-৬% অর্থ দিতে হয়।[২০৫] এ প্রসঙ্গে একটি কার্যালয়ের একজন কম্পিউটার অপারেটর জানান, "ইঞ্জিনিয়ারদের টাকা না দিয়ে ভালো কাজ করলেও কোন লাভ নাই। কারণ তাদের টাকা দিলেই তারা বিলে সাইন করে। ইঞ্জিনিয়ারকে টাকা না দিলে তারা বলবে যে ইট ভালো হয় নাই, বালু ভালো হয় নাই। যে সব কাজ প্রজেক্ট ডাইরেক্টরের তাকে ৩/৪ শতাংশ দিতে হয়। সাইক্লোন সেন্টারের কাজের পিডি ৬ শতাংশ চায়। এলজিইডি'র ক্ষেত্রে যে অফিসের কাজ সে অফিসের প্রধানকে দিতে হয়। সিটি করপোরেশনের কাজের ২০ শতাংশ দিতে হয়।[২০৬]

[২০২] একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[২০৩] ক্ষমতাসীন দলের একজন স্থানীয় নেতা ও একাধিক ঠিকাদারের দেওয়া তথ্য তথ্য অনুযায়ী।
[২০৪] একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৯ অক্টোবর ২০১৯।
[২০৫] গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো এলাকার একাধিক ঠিকাদারের তথ্য অনুযায়ী।
[২০৬] একটি কম্পিউটার দোকানের মালিক, যিনি ঠিকাদারদের হয়ে নিয়মিত দরপত্র জমা দেন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ, ৬ আগস্ট ২০১৯।

এছাড়া কোনো কাজের উদ্বোধনের সময় মন্ত্রী বা স্থানীয় সংসদ সদস্য আসলে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হয়।[২০৭]

বক্স ৩: ঠিকাদারের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায়

"এলজিইডি'র যে এক্সেন তিনি টাকা ছাড়া কোনো কথা বলেন না। আমি একটা কাজ করেছিলাম এলজিইডি'র, কাজটা শেষ করে দিছি, বলতেছে সরকারি ফান্ড নাই। বিলটা নিতে পারি নাই। এরপর আসছে বর্ষা। উপজেলা প্রকৌশলী বললো রাস্তা বর্ষাকালে ভেঙ্গে যাবে। উনার ফান্ড নাই বলে আমাকে আর বিল দেয় না। কিন্তু ওনারা জানেন রাস্তাটা ভাঙ্গবে। নিচ থেকে মাটি সরে গেছে। এখন আমার বিলটা আটকে গেছে। এখন আমি সিমেন্টের বস্তায় বালু ভরে দিছি। যাতে রাস্তা আর ভাঙ্গতে না পারে। গাড়ি চলাচল করতে পারে। এখন বলছে এটা ঠিক করে দিতে হবে। এটা ঠিক করতে আমার খরচ লাগবে ২ থেকে আড়াই লাখ টাকা। এখন এই টাকা কি আমি আমার বাড়ি বিক্রি করে এনে দিব? আমি ২০ লাখ টাকার কাজ করলাম, এই ২ লাখ টাকার জন্য কি আমার ২০ লাখ টাকার মাইর যাবে? পরে উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারকে ১ লাখ টাকা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারকে ম্যানেজ করে কাজটা কমপ্লিট করে টাকা নিয়ে আসছি। কাজটা কমপ্লিট বলতে ওনারা প্রগ্রেস রিপোর্টে দেখাবে যে বালু সরে যাওয়ার কারণে রাস্তা ভেঙ্গে গেছে। এতে ঠিকাদারের কোন দোষ নাই। মানি ২০ লাখ টাকায় ১ লাখ টাকা দিতে হইছে আমার বিল ছুটানোর জন্য। তার মানে কেউ যদি ১ কোটি টাকার কাজ করে উনাকে দিতে হবে ৫ লাখ টাকা। এরকমই ওনারা নিতেছেন।"

- একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

সারণি ১৬: একনজরে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের খাত ও পরিমাণ

কাজের ধরন	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের পরিমাণ
কম্পিউটার অপারেটরের মাধ্যমে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে	▪ ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা
এসটিমেট জানানো	▪ ৫০০ টাকা
ওয়ার্ক অর্ডার আনার ক্ষেত্রে	▪ এলজিইডি'তে ০.২৫% থেকে ১% ▪ পানি উন্নয়ন বোর্ডে ৩-৫%, জরুরি কাজের ক্ষেত্রে ৪%
ল্যাব টেস্ট	▪ এলজিইডি'তে থোক টাকা
তদারকির সময়	▪ সড়ক ও জনপথে থোক টাকা (যেমন ১ কোটি টাকার কাজে ৫০,০০০ টাকা) ▪ এলজিইডি'র ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালককে ৩% থেকে ৪%; সাইক্লোন সেন্টারের কাজে ৬%
মূল্যায়ন কমিটি	▪ ২%
অনুমোদন কমিটি	▪ ১%
বিল তুলতে	▪ এলজিইডি'তে ৫% ▪ পানি উন্নয়ন বোর্ডে ২-৬%
সাব-কন্ট্রাক্ট বা কাজ বিক্রির ক্ষেত্রে	▪ ২ থেকে ১০%
কম্পিউটার অপারেটর কর্তৃক এসটিমেট জানানোসহ দরপত্র জমা দেওয়া	▪ এলজিইডি'র ক্ষেত্রে ওটিএম-এ ৩,০০০ টাকা, এলটিএম-এ ১,৫০০ থেকে ২,০০০ টাকা

ঠিকাদার পর্যায়ে দুর্নীতি

ঠিকাদারদের মধ্যে যোগসাজশ: বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আগে থেকেই ঠিকাদারদের মধ্যে 'সিন্ডিকেট' করা থাকে, ফলে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজ কে পাবে তা এভাবেই নির্দিষ্ট করা হয়। বিশেষকরে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে এ ধরনের অনিয়ম তুলনামূলকভাবে বেশি। এক্ষেত্রে কোনো একটি জেলা বা উপজেলায় ঠিকাদারদের মধ্যে পরস্পর যোগসাজশ করে দরপত্র জমা দেওয়া এবং কাজ পাওয়ার পর ভাগ করে কাজ বাস্তবায়ন করার ঘটনা ঘটে। যেমন, কোনো এলাকায় পাঁচজন ঠিকাদারের একটা সিন্ডিকেট থাকলেও তাদের মধ্যে হয়তো একজন আবেদন করে, বাকিরা করে না - এই শর্তে যে ঐ একজন কাজ পেলে তাদেরকে কাজের ভাগ দেবে। সাধারত সংশ্লিষ্ট এলাকার বাইরের ঠিকাদারদের কাজ করতে দেওয়া হয় না। এমনকি কখনো কখনো দরপত্র প্রত্যাহার করানোর মতো ঘটনায় ঘটে।[২০৮]

ঠিকাদার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগসাজশ: অনেকক্ষেত্রে ঠিকাদার, স্থানীয় রাজনৈতিক নেনতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের সাথে কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমঝোতা হয়, এবং কাজের মান খারাপ হলেও কিংবা কাজের অগ্রগতি কম হলেও ভালো প্রতিবেদন দিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তাকে কাজের মূল্যের ১.৫-৫ শতাংশ পর্যন্ত ঘুষ হিসেবে দিতে হয়।

অন্যের লাইসেন্স/ সার্টিফিকেট ব্যবহার করা: ঠিকাদারদের মধ্যে কাজ পাওয়ার জন্য অনেক কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লাইসেন্স ব্যবহার করে দরপত্র দাখিল করার চর্চা খুবই প্রচলিত। এক্ষেত্রে যার নামে লাইসেন্স তাকে একটি কমিশন দেওয়া হয়, যার

[২০৭] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
[২০৮] একাধিক স্থানীয় সাংবাদিক, ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

পরিমাণ প্রায় ১০-১৩ শতাংশ। এর ফলে যত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠিকাদার রয়েছেন তার খুব কম সংখ্যক নিয়মিত কাজ করে থাকেন। এমনকি যার নিজের লাইসেন্স নেই তিনিও এভাবেই অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার করে কাজ করেন। দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও এভাবে কাজ নিয়ে কাজ ভাগ করে দেন।[২০৯]

বক্স ৪: কাজ বিক্রি

"আমার মালিকের বন্ধুর থেকে নিয়ে দিছে। তিনি হচ্ছেন নর্থ বেঙ্গলের। সেটা নিছি ১০ শতাংশে। কাজটা যদি ২০ লাখ টাকার হয় সেখান থেকে সার্টিফিকেটধারীকে ২ লাখ টাকা দিতে হবে। লাভ হয় সেটা অন্যভাবে আমরা পোষায়া নেই। যেমন দেখা গেছে প্রজেক্ট মূল্য ২০,০০,০০০ টাকা। ১০% দিয়ে কিনলে থাকে ১৮,০০,০০০ টাকা, সেখান থেকে আমাদেরকে ১,০০,০০০ টাকা প্রফিট করতে হবে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে ১৭,০০,০০০ টাকার কাজ ফিল্ডে বাস্তবায়ন হয়।"

- একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৭ অক্টোবর ২০১৯

অবৈধভাবে কাজ বিক্রি করে দেওয়া বা সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া: বড় ঠিকাদারদের লাইসেন্স ব্যবহার করে কাজ পেয়ে সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করার প্রবণতা দেখা গেছে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া বৈধ হলেও তার একটি সীমা আছে এবং এক্ষেত্রে ঘোষণা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।[২১০] তবে একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী বলেন 'প্রাক্টিসে একজনে কাজ নিয়ে অন্যজনকে দিয়ে কাজ করায় সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার আছে কিনা এটা যদি বলেন আমি বলবো আছে। পিপিআরর এ একটা আইন আছে সাব কন্ট্রাক্টরের ক্ষেত্রে। তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতে যার সাথে চুক্তি হয়, কাজের মান খারাপ হলে তাকেই জবাবদিহি করতে হয়। এক্ষেত্রে কে কাজ করেছে তা বিবেচ্য নয়। প্রয়োজন হলে চুক্তিও বাতিল করা হয়।[২১১]

গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের মানের ওপর বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ই-জিপি প্রবর্তন সত্ত্বেও কাজের মানের বিষয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে।[২১২] এছাড়াও দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে সওজ-এর কিছু দুর্নীতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সওজ-তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ই-জিপি টেন্ডারিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেও টেন্ডারের শর্তানুসারে প্রদত্ত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন না করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের চাপে অথবা পরস্পর যোগসাজশে একশ্রেণির প্রকৌশলী/ কর্মকর্তা অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে থাকেন। ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট পদ্ধতি দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। কাজ পাওয়ার জন্য অনেকসময় বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি, পরামর্শক সংস্থা, সরকারি কর্মকর্তাদের উৎকোচ প্রদান করতে হয় মর্মে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্মাণকাজের প্রাক্কলন ও নকশা বা ডিজাইন দুর্নীতির আর একটি উৎস। অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রাক্কলন, টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি, যেমন টেন্ডারের তথ্য ফাঁস, নেগোসিয়েশনের নামে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে সাপোর্টিং বা এজেন্ট ঠিকাদার নিয়োগ, বার বার নির্মাণ কাজের ডিজাইন পরিবর্তন, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার, টেন্ডারের শর্তানুসারে কাজ বুঝে না নেওয়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেরামত বা সংস্কার কাজের নামে ভুয়া বিল-ভাউচার করে অর্থ আত্মসাৎ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা/ প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক বেনামে অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের মাধ্যমে ঠিকাদারি কাজ

[২০৯] একাধিক স্থানীয় ঠিকাদার ও কম্পিউটার দোকানের মালিক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

[২১০] পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৫৩ নং বিধিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

[২১১] এলজিইডি'র একজন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট ২০১৯।

[২১২] *দৈনিক সমকাল*, 'নদীভাঙন রোধ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ, ২ মার্চ ২০২০, https://samakal.com/todays-print-edition/tp-lokaloy/article/200329268/; *দৈনিক সমকাল*, 'ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রকল্প: গলদ খুঁজতে মাঠে পাউবো', ১ নভেম্বর ২০১৯; *দৈনিক সমকাল*, 'কয়রায় পাউবোর বাঁধ: ঠিকাদারি বেচাকেনা বন্ধ হোক, ২৩ মে ২০১৯, https://samakal.com/todays-print-edition/tp-editoriaal/article/19053970/; *দৈনিক সমকাল*, 'হাওরে ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণে দুর্নীতি: ৩৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিচ্ছে দুদক', ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, https://samakal.com/sylhet/article/1902727/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'হাওরে ফসল রক্ষা বাঁধ: টাস্কফোর্সের জরিপে সাগর চুরির চিত্র', ২৩ জুলাই ২০২০, https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/328506/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'চাঁপাইয়ে পাউবোর দুর্নীতির অভিযোগ দুদকে', ২১ জুন ২০২০, https://www.jugantor.com/todays-paper/city/318066/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কালামের কমিশন বাণিজ্য', ৫ মার্চ ২০২০, https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/285379/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'নবীগঞ্জে নদী ভাঙনরোধ প্রকল্পে দুর্নীতি', ১২ জুলাই ২০১৯, https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/198338/; *দৈনিক যুগান্তর*, '২৬৮ কোটি টাকার দরপত্রে অনিয়ম', ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/22343/; *দৈনিক প্রথম আলো*, 'গোপনে দর বলে দেওয়া হয়', ২৭ আগস্ট ২০২০, https://www.prothomalo.com/business/; *দৈনিক সমকাল*, 'সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে দুদকের অভিযান', ৭ নভেম্বর ২০১৮, https://www.samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/18111434/; *দৈনিক সমকাল*, 'ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কাজ না করেই বিল তুলে নেওয়ার অভিযোগ', ১৯ আগস্ট ২০১৮, https://samakal.com/todays-print-edition/tp-lokaloy/article/18083919/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'বিদ্যুৎ সংযোগবঞ্চিত গ্রাহক: কুড়িগ্রামে সঞ্চালন লাইন নির্মাণে বিলম্ব ও দালালের দৌরাত্ম্য', ২১ ডিসেম্বর ২০১৯, https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/257907/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'আইএমইডির প্রতিবেদন: পল্লী বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ প্রকল্পে নানা ত্রুটি, এপ্রিল পর্যন্ত ব্যয় ১ হাজার ৬৪৫ কোটি টাকা', ১১ জুন ২০১৮, https://www.jugantor.com/todays-paper/industry-trade/58678/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'ঘাটে ঘাটে দুর্নীতি পল্লী বিদ্যুতে: কোনো সমন্বয় নেই, একক কর্তৃত্বে চলছে সব কটি সমিতি', ৮ নভেম্বর ২০১৯, https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/241531/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'পল্লী বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার কেনায় অনিয়ম: মুজিববর্ষে সারা দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন অনিশ্চিত', ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০, https://www.jugantor.com/todays-paper/news/273592/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'ঠিকাদারের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে ২০ লাখ টাকার ব্যবস্থা', ৫ মার্চ ২০২০, https://www.jugantor.com/todays-paper/city/285432/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'দুমকিতে সড়ক নির্মাণে অনিয়ম', ১৪ এপ্রিল ২০১৯, https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/166942/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'মনিরামপুরে সড়ক নির্মাণে অনিয়ম', ১২ জুন ২০১৯, https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/186792/; *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ফরিদপুরে দুই ভাই কাহিনি: সন্ত্রাসীদের হাতে রাজনীতির 'চেরাগ'', ২৮ জুলাই ২০২০, https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/

পরিচালনা, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ এবং ঠিকাদার ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর অনৈতিক সুবিধা লাভ দুর্নীতির উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।[২১৩]

নির্দেশক ২০: ই-জিপি'র ফলে কাজের মান বৃদ্ধি

ই-জিপি পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ হওয়ার কারণে ভালো ও দক্ষ ঠিকাদারদের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে কাজ বাস্তবায়নে দুর্নীতি কম হওয়াসহ কাজের মান ভালো হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের অধিকাংশের মতে, ই-জিপি'র সাথে কাজের মানের সম্পর্ক নেই। তাদের মতে কাজের মান তদারকির ওপর নির্ভরশীল, যা অনেকাংশে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব। মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে, দরপত্র প্রক্রিয়া প্রতিযোগিতামূলক হওয়া, দরপত্র প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা, সঠিক পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদির ওপর কাজের গুণগত মান নির্ভর করে।

তথ্যদাতাদের মতে ই-জিপি'র কারণে কাজ ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কাজ বিক্রি করার কারণে সেটা নষ্ট হচ্ছে। একজন ঠিকাদার বলেন, "বড় ঠিকাদারদের সার্টিফিকেটের সংখ্যা বেশি। ফলে তারাই কাজ পায়। তারা নিজেরা কাজ করে না। কাজ পায় পরে ২%-৩% এর বিনিময়ে কাজ বিক্রি করে দেয়। বিধিমালা পড়ার সময় নেই, আমরা ছোট ঠিকাদার আমাদের ওসব নিয়ে ভাবার সময় নাই। আমার লোক আছে তিনি সব (ম্যানেজ) করেন"।'[২১৪] আরেকজন ঠিকাদারের মতে "বড় (ঠিকাদার) যারা কাজ পাচ্ছে তারা কাজটা বিক্রি করে দিচ্ছে। এখন বড়রা কজ করার ফলে যে কোয়ালিটিটা হতো ছোটদের কাছে কাজ বিক্রি করার কারণে সে কোয়ালিটিটা এনশিউর হচ্ছে না, এটা তো বাস্তব"।[২১৫] গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের মানের ওপর বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ই-জিপি প্রবর্তন সত্ত্বেও কাজের মানের বিষয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে।[২১৬]

তবে কোনো কোনো তথ্যদাতার মতে ভালো ঠিকাদার পাওয়া ও কাজ ভালো হওয়ার সাথে আগের কাজের সম্পর্ক রয়েছে। আগের কাজের মানের ভিত্তিতে যদি নির্বাচন করা হয় তাহলে ভালো ঠিকাদার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাদের মতে ই-জিপির কারণে কাজের মান কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে, যেহেতু পরবর্তী কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে কাজের গুণগত মান থাকাটা জরুরি।'

[২১৩] দুর্নীতি দমন কমিশন, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৭, ঢাকা, পৃ. ৮৯-৯০।

[২১৪] একজন ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২৯ আগস্ট ২০১৯।

[২১৫] সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

[২১৬] দেখুন *দৈনিক সমকাল*, 'ভাঙন ঠেকাতে যমুনার তীরে বালুর বাঁধ, স্থায়িত্ব নিয়ে শঙ্কা', ১০ মার্চ ২০২০, https://samakal.com/todays-print-edition/tp-lokaloy/article/200330949/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'একাধিক ব্যক্তির কাছে 'কন্ট্রাক্ট' বিক্রি করায় কাজ যথাযথ হয় না', ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯, https://www.jugantor.com/todays-paper/city/219239/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'বান্দরবানে এলজিইডির কাজে দুর্নীতি', ১৫ জুন ২০১৮, https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/60255/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'সড়ক নির্মাণে দুর্নীতি', ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯, https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/261300/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'ঠাকুরগাঁওয়ে রাস্তা নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ', ৯ জুলাই ২০২০, https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/324217/; *দৈনিক যুগান্তর*, 'নির্মাণের ৬ দিনের মাথায় হাতের ছোঁয়ায় উঠে যাচ্ছে পিচঢালা', ৩ জানুয়ারি ২০২০, https://www.jugantor.com/country-news/262919/; *দৈনিক সমকাল*, 'কার্পেটিং করা সড়কের ওপর ইটের সলিং', ২৮ জুলাই ২০১৮, https://www.samakal.com/todays-print-edition/tp-upakhantho/article/18075928/; *দৈনিক সমকাল*, 'দুই বছরও টিকছে না নতুন সড়ক! মানহীন নির্মাণ কাজ ও মাত্রাতিরিক্ত ভার বহন', ২৮ জুলাই ২০১৮, https://samakal.com/todays-print-edition/tp-first-page/article/18075975/; *দৈনিক সমকাল*, 'ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেন মহাসড়ক: বছর না যেতেই ভগ্নদশা', ২ জুন ২০১৮, https://samakal.com/bangladesh/article/180652; *দি ডেইলি স্টার*, 'কাদের আনহ্যাপি ওভার কোয়ালিটি অব রোডস', ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০, https://www.thedailystar.net/country/news/quader-unhappy-over-quality-roads-1704340।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্র ও নির্দেশকে প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান ও প্রাপ্ত স্কোর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে ই-জিপি'র ইতিবাচক প্রভাব, সীমাবদ্ধতা এবং ই-জিপি'তে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সুশাসনের ঘাটতির কারণ পর্যালোচনা এবং তার ভিত্তিতে সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

৫.১. ই-জিপি'র ইতিবাচক প্রভাব

ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে বেশ কিছু ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

সময়ক্ষেপণ কমে যাওয়া: গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ই-জিপি প্রবর্তনের পর বেশ কিছু কার্যক্রম, যেমন শিডিউল ছাপানো, শিডিউল কেনা ও জমা দেওয়া, নথি সংগ্রহ ও যাচাই করা ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ কমে গেছে। উল্লেখ্য, ওটিএম পদ্ধতিতে কাজের ক্ষেত্রে ২০১১ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ক্রয়ের সময় (দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত) ৯৪ থেকে ৫৯ দিনে নেমে এসেছে, এবং এর ফলে ২০১২ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাশ্রয় হয়েছে।[২১৭] বর্তমানে ঠিকাদারদেরও সময় কম লাগছে।[২১৮]

প্রক্রিয়া সহজতর হওয়া: ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে দরপত্র প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর তৃণমূল পর্যায়ের কার্যালয়ে ক্রয়ের সুবিধা বেড়েছে। সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা বেড়েছে। ঠিকাদারদের জন্য দেশের যেকোনো জায়গা থেকে দরপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।[২১৯] একইভাবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও তুলনামূলকভাবে কমে গেছে।

সবার অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি: দেশের যেকোনো জায়গা থেকে দরপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ বেড়ে যাওয়ার ফলে অংশগ্রহণের সুযোগও বেড়েছে।[২২০]

দরপত্র জমা-সংক্রান্ত সমস্যা দূর হওয়া: দরপত্র নিয়ে সব ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি, বোমা হামলা, দরপত্র বাক্স ছিনতাই ও চুরি, দরপত্র জমায় বাধা দেওয়া, দরপত্র বাক্স নিয়ে আসতে বাধাসহ 'টেন্ডারবাজি' বন্ধ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের মতে আগে টেন্ডার জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে উত্তেজনাকর পরিবেশ বিরাজ করতো, ভয়ের পরিবেশ কাজ করতো। সেটি এখন কমে গেছে বা নেই বললেই চলে। ফলে দরপত্র জমা সংক্রান্ত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে।[২২১]

দরপত্র মূল্যায়নে দুর্নীতি হ্রাস: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনো কর্মকর্তা ও ঠিকাদারের মতে দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে দরপত্র হারিয়ে যাওয়া, দরপত্রের কোনো কাগজ হারানো, দরপত্র চুরি হওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঘটলেও বর্তমানে এ ধরনের ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে ই-জিপি ব্যবস্থা অনলাইন হওয়ার কারণে একবার কোনো নথি জমা পড়লে তা পরিবর্তন করা যায় না। পূর্বে অভিজ্ঞতার সনদ ছিঁড়ে ফেলে অযোগ্য বা কম যোগ্য দেখানো, 'লেস' পরিবর্তন করা ইত্যাদি ঘটলেও বর্তমানে তার সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে একজন উপজেলা প্রকৌশলী বলেন, "আমি একটি কাগজ সরাই ফেলতে পারতাম। এখন আর সুযোগ নাই"।[২২২] একইভাবে কারও কারও মতে রাজনৈতিক প্রভাব, ক্ষমতার প্রভাব, পেশী শক্তির ব্যবহার, অন্যায় আবদার, অনৈতিক লেনদেন ইত্যাদির সুযোগ কমে গেছে, যেহেতু একজন ঠিকাদারকে সব কাগজপত্র জমা দিয়ে আবেদনের যোগ্যতা নিশ্চিত করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না বলে পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ কম। তাদের মতে এর ফলে তাঁরা প্রভাবমুক্ত হয়ে মূল্যায়ন করতে পারেন।[২২৩]

৫.২. ই-জিপি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ই-জিপি বাস্তবায়নে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যায়। এসব সীমাবদ্ধতাকে প্রাতিষ্ঠানিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সীমাবদ্ধতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

ভৌত ও কারিগরি সমস্যা: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের উপজেলা পর্যায়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভৌত ও কারিগরি সমস্যা বিদ্যমান, যার ফলে ই-জিপি বাস্তবায়নে এসব প্রতিষ্ঠান বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এসব ভৌত ও কারিগরি সমস্যার মধ্যে রয়েছে

---

[২১৭] বিশ্বব্যাংক, ২০২০, 'অ্যাসেসমেন্ট অব বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম', ©বিশ্ব ব্যাংক।

[২১৮] মুখ্য তথ্যদাতাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

[২১৯] ঠিকাদারদের মতামত অনুযায়ী।

[২২০] সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোর একাধিক কর্মকর্তা এবং ঠিকাদারদের মতামত অনুযায়ী। বিশ্বব্যাংক, ২০২০, 'অ্যাসেসমেন্ট অব বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম', ©বিশ্ব ব্যাংক।

[২২১] পাউবো ও এলজিইডি'র একাধিক কর্মকর্তা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ও ১০ অক্টোবর ২০১৯।

[২২২] এলজিইডি'র একজন উপজেলা প্রকৌশলী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৪ আগস্ট ২০১৯।

[২২৩] পাউবো ও এলজিইডি'র একাধিক কর্মকর্তা ও ঠিকাদার, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ৬ আগস্ট, ১৫ সেপ্টেম্বর, ৯ ও ১০ অক্টোবর ২০১৯।

ইন্টারনেটের কম গতি, লজিস্টিকসের ঘাটতি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি, দরপত্র খোলার জন্য অপর্যাপ্ত সময় (মাত্র এক ঘণ্টা), এবং ঠিকাদারদের নথিপত্র হাতে-কলমে যাচাই করা। এসব সীমাবদ্ধতার ফলে সময়ক্ষেপণ হচ্ছে।

পর্যাপ্ত ও প্রশিক্ষিত জনবলের ঘাটতি: কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত ও প্রশিক্ষিত জনবলের ঘাটতি বিদ্যমান (যেমন এলজিইডি, পাউবো)। এর ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ওপর কাজের চাপ রয়েছে।

দক্ষতার ঘাটতির কারণে দুর্নীতির সুযোগ: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ক্রয় কর্মকর্তার (পিই) ই-জিপি পরিচালনায় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাঁর পাসওয়ার্ড ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে ঐ কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটরকে ই-জিপি পরিচালনা করতে বলা হয়। একইসাথে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেটররা ঠিকাদারদের হয়ে নিবন্ধন, দরপত্র দাখিল ইত্যাদি কাজ করে থাকেন। এর ফলে তথ্য ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

ই-জিপি বাস্তবায়নে ঘাটতি: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি বাস্তবায়নে ঘাটতি বিদ্যমান। প্রথমত, এসব প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে ই-জিপি অনুসরণ করা হচ্ছে না, বিশেষকরে সব প্রতিষ্ঠানের সব ক্রয় এখনো ই-জিপি'তে হয় না। উল্লেখ্য, বিশেষ ও জরুরি ক্রয়, আন্তর্জাতিক ব্যাংকের সাথে চুক্তি না থাকার কারণে আন্তর্জাতিক ক্রয় ই-জিপি'তে এখনো সম্পন্ন হয় না। দ্বিতীয়ত, প্রকল্পের কাজ পরিবর্তন হওয়ার অজুহাতে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন (এপিপি) কোনো প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয় না। তৃতীয়ত, কোনো প্রতিষ্ঠানেই প্রাক-দরপত্র মিটিং করা হয় না। উপরোক্ত সবগুলো ঘাটতিই সরাসরি ই-জিপি গাইডলাইনের ব্যত্যয়।

কেন্দ্রীয় (সিপিটিইউ) পর্যায়ে সীমাবদ্ধতা

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কিছু সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যায়, যার দায়িত্ব সার্বিকভাবে সিপিটিইউ-এর ওপর বর্তায়।

কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারের অনুপস্থিতি: এখন পর্যন্ত সিপিটিইউ সব ঠিকাদারের তথ্য সংবলিত একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারে নি। এর ফলে সকল ঠিকাদারের কাজের অভিজ্ঞতাসহ কোনো হালনাগাদ তথ্য পাওয়ার উপায় নেই, ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঠিকাদারদের দেওয়া কাজের সনদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এসব সনদ যাচাই করারও কোনো অনলাইন ব্যবস্থা না থাকার ফলে সব ঠিকাদারের সব সনদ যাচাই করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, কাজের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ঠিকাদারদের কোনো শ্রেণিবিন্যাস করা নেই। ফলে কোন ঠিকাদার কোন ধরনের, পরিমাণের ও মূল্যের কাজ করতে পারবেন তা যাচাই করতে হয়।

কেন্দ্রীয় বা সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন কাঠামোর ঘাটতি: ই-জিপি সিস্টেমে এখন পর্যন্ত কোনো কেন্দ্রীয় বা সমন্বিত ও স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন ব্যবস্থা তৈরি করা হয় নি। কেবল সওজ'তে একটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে দরপত্র সংক্রান্ত সব কাগজপত্র প্রিন্ট করে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়, এবং চুক্তি সম্পন্ন করে তারপর তা ই-জিপি সিস্টেমে আপলোড করা হয়। ক্রয় কার্য-প্রণালী অনুযায়ী সিস্টেমের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় তবে মূল্যায়ন ম্যানুয়াল করে অনলাইনে আপলোড করা হয়।

কারিগরি সীমাবদ্ধতা: ই-জিপি সফটওয়্যারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনো সমস্যা মোকাবেলা করতে হয় ব্যবহারকারীদের। সফটওয়্যারের সমস্যার কারণে নোটিফিকেশন অ্যাওয়ার্ড দিতে সমস্যা হয়। এছাড়া সিস্টেমে পর্যায়ক্রমে যেতে সমস্যা হয় বলেও জানা যায় - যে ধাপ আসার কথা সেটা না এসে অন্যটা আসে। অনেক সময় নোটিফিকেশন অ্যাওয়ার্ড-এ দুইজনের নাম চলে আসে, যেখানে একজনের নাম আসার কথা। এছাড়া সিকিউরিটি নেওয়ার জন্য ব্যাংকে যেতে হয়। কোনো কোনো ব্যবহারকারীর মতে এটি ব্যবহার-বান্ধব নয়, এবং পুনঃদরপত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন করে কাজ করতে হয়। এছাড়া অনেকে সার্ভার ধীরগতির বলে অভিযোগ করেছেন, যার ফলে দরপত্র জমা দেওয়া যায় নি।[২২৪]

সমন্বিত সনদের অনুপস্থিতি: দরপত্র জমা দেওয়ার সময় যেসব সনদের অনুলিপি চাওয়া হয় তার স্পেসিফিকেশন একেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্য একেক রকম। ফলে একই কাজের সনদের জন্য একজন ঠিকাদারকে ভিন্ন ভিন্ন সনদ নিতে হয়। এক্ষেত্রে একটি সমন্বিত সনদের প্রয়োজন রয়েছে।

অংশীজনের নিবন্ধনে ঘাটতি: ক্রয় সংক্রান্ত প্রধান অংশীজন, যেমন ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার ও ব্যাংক ই-জিপিতে নিবন্ধিত হলেও অন্যান্য অংশীজন, যেমন সাধারণ জনগণের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সিপিটিইউ থেকে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে।

ঠিকাদারদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ: সিপিটিইউ এখন পর্যন্ত একটি বিপুল সংখ্যক অংশীদারকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসলেও অনেক ঠিকাদার ই-জিপি'র ওপর এখনো প্রশিক্ষণ পান নি। ফলে তাদের এখনো সংশ্লিষ্ট সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার অপারেটর, স্থানীয় কম্পিউটারের দোকার ইত্যাদির ওপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়া দরপত্রের বিস্তারিত ও ফরম ইংরেজি ভাষায় হওয়ার কারণে অনেক ঠিকাদারের বুঝতে সমস্যা হয় বলে জানা গেছে।

---

[২২৪] ঠিকাদারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯; এছাড়া একজন দরপত্রদাতা বলেন, "তিনটা ফোল্ডারের পরে নতুন ট্যাব তারা তৈরি করতে পারে কমন ফাইল নামে। বার বার একই ফাইল আপলোড দিলে তাদের ব্যান্ডউইথ অপচয় হয়, এটা রোধ করতে পারে।" সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

৫.৩. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ওপর সংগৃহীত তথ্য ও ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি'র প্রবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পদক্ষেপ। পূর্বের ক্রয় চর্চায় যেসব সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ ছিল সেসব থেকে উত্তরণের একটি আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে ই-জিপি আবির্ভূত হয়েছে। ২০১১ সালে প্রবর্তনের পর থেকে ধীরে ধীরে এর সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ ঘটছে, প্রায় সব সরকারি প্রতিষ্ঠান এই ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে, এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, বাজেট ও জনবলের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে, যা এখনো চলমান। তবে দেখা যাচ্ছে প্রবর্তনের প্রায় নয় বছর পরও ই-জিপি'র ব্যবহার এখনো সীমিত - সব প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয় ই-জিপি'র অধীনে হচ্ছে না, এবং এর ব্যবহার এখনো ক্রয়াদেশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ই-জিপি'র ব্যবহার ও কার্যকারতার দিক থেকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানই ভালো কিংবা সন্তোষজনক স্কোর করতে পারে নি। উল্লেখ্য, এই প্রতিষ্ঠানগুলোই সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ই-জিপি বাস্তবায়ন করছে।

আরও দেখা যাচ্ছে ই-জিপি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো কোনো কোনো কাজে ম্যানুয়াল পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। বিশেষকরে দরপত্র মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম এখনো কাগজে-কলমে করা হয়। এর ফলে ই-জিপি'র মূল উদ্দেশ্য - অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন, অনেকখানি ব্যাহত হচ্ছে। ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনাও এখনো শুরু হয় নি। এসব ক্ষেত্রে এখনো উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

ই-জিপি'র অন্যতম প্রধান দুইটি উদ্দেশ্য ছিল সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি হ্রাস করা ও সম্পাদিত কাজের মান বাড়ানো। তবে দুঃখজনকভাবে দুর্নীতি ও কাজের মানের ওপর ই-জিপি'র কোনো প্রভাব লক্ষ করা যায় না। ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অনেক সহজ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী ও দরদাতা উভয়ের জন্য এটি ব্যয়, শ্রম ও সময়সাশ্রয়ী। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কার্যাদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ ও দরদাতাদের সিন্ডিকেট এখনো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এখনো স্থানীয় সংসদ সদস্য বা রাজনৈতিক নেতার প্রভাবে নেওয়া হচ্ছে, যেখানে কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও দরদাতাদের সিন্ডিকেটও জড়িত থাকে। অন্যদিকে এর পাশাপাশি কাজ নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া, অবৈধভাবে সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া, এবং কাজ ভাগাভাগির কারণে কাজের মানের ওপরও ই-জিপি'র কোনো ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায় না।

ফলে বলা যায় ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে ম্যানুয়াল থেকে কারিগরি পর্যায়ে সরকারি ক্রয়ের উত্তরণ ঘটলেও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের একাংশ দুর্নীতির নতুন পথ খুঁজে নিয়েছে। প্রক্রিয়াগতভাবে যেসব দুর্নীতি আগে প্রচলিত ছিল, কারিগরি পর্যায়ে তা এখন সম্ভব না হলেও এই প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে দুর্নীতির নতুন উপায় খুঁজে নিয়েছে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের একাংশ। এক অর্থে দুর্নীতি এখন আরও বেশি সংগঠিত ও পরিকল্পনামাফিক সমঝোতার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। তবে একে ই-জিপি'র ব্যর্থতা বলা সঙ্গত হবে না।

সবশেষে বলা যায়, ই-জিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনো কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনাগত সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। এসব সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ ঘটালে ই-জিপি'র সুফল পুরোপুরি পাওয়া যাবে।

৫.৪. সুপারিশ

গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিচে কয়েকটি সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

১. ই-জিপি'কে রাজনৈতিক প্রভাব, যোগসাজশ ও সিন্ডিকেটের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করতে হবে; সেই লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও জনগুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে অবস্থিত ব্যক্তির রাষ্ট্রের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবসায়িক সম্পর্কের সুযোগ বন্ধ করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

২. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে করতে হবে।
৩. ই-জিপি পরিচালনার জন্য কাজের চাপ ও জনবল কাঠামো অনুযায়ী ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে জনবল বাড়াতে হবে।
৪. ই-জিপি'র সাথে সম্পর্কিত সব অংশীজনকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য প্রতি জেলায় সিপিটিইউ'র তত্ত্বাবধায়নে একটি প্রশিক্ষণ ইউনিট গঠন করতে হবে, যারা মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় পর পর ঠিকাদার, ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৫. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রত্যেক অর্থবছরের শুরুতে তৈরি করতে হবে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

ই-জিপি প্রক্রিয়া

৬. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে প্রাক-দরপত্র মিটিং নিশ্চিত করতে হবে।
৭. ঠিকাদারদের একটি অনলাইন ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে যেখানে সকল ঠিকাদারের কাজের অভিজ্ঞতাসহ হালনাগাদ তথ্য থাকবে। কাজের ওপর ভিত্তি করে ঠিকাদারদের আলাদা শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে, যা সঠিক ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

৮. সিপিটিইউ-এর পক্ষ থেকে একটি সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় দরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকতে হবে যা সব সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করবে।
৯. সিপিটিইউ-এর পক্ষ থেকে সব প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সমন্বিত সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা করতে হবে।

ই-জিপি ব্যবস্থাপনা

১০. সিপিটিইউ-এর পক্ষ থেকে ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও কার্যাদেশ বাস্তবায়ন তদারকি ই-জিপি'র অধীনে শুরু করতে হবে।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকরতা

১১. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে ই-জিপি গাইডলাইন অনুযায়ী নিরীক্ষা করাতে হবে।
১২. দরপত্র সংক্রান্ত সব তথ্য ও সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের জন্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।
১৩. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ই-জিপি'র সাথে জড়িত সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিজস্ব ও পরিবারের অন্য সদস্যদের আয় ও সম্পদের বিবরণী প্রতিবছর শেষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে ও তা প্রকাশ করতে হবে।
১৪. প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে তদারকি করতে হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ থাকতে হবে। এর জন্য স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে তদারকির (কমিউনিটি মনিটরিং) চর্চা শুরু করা যেতে পারে। একইভাবে প্রত্যেক ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিতভাবে গণশুনানি আয়োজন করতে হবে।

****